যুদ্ধের দক্ষিণা

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

শ্রীতরুলতা সেন বি-এ কর্তৃক
৩০২ আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ
মূল্য ২৲ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা

304-4-44]

ভূমিকা

বাংলায় ধনবিজ্ঞান-গবেষণা

এই বই বাংলায় বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে লড়াইয়ের খর্চা কাহাকে বলে। আমরা আগে বাঙালী, তারপর ভারতবাসী। কাজেই বাংলা লেখার কিম্মৎ আমার হিসাবে লাখ টাকা। ইংরেজিতে এই বই দেখিলে আমার মেজাজ এতটা শরীফ হইত কিনা জানি না।

অবশ্য ইংরেজি বা আর কোনো ভাষা বয়কট করা আমার রেওয়াজ নয়। তবে ধনবিজ্ঞানের মাল বাঙালীর পাতে বাংলায় পরিবেষণ করা হইতেছে ;—এই দৃশ্য দেখিবা মাত্র এই অধমের বুকটা আপনা-আপনি ফুলিয়া উঠিল। এই জন্যই কলম ধরিলাম।

দুঃখের কথা,—১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব হইতে আজ পর্যন্ত আটত্রিশ বৎসরের ভিতর বাঙালীর হাতে ধনবিজ্ঞান বিষয়ক বই,—কি বাংলায়, কি ইংরেজিতে,—বেশী কিছু বাহির হইল না। বইয়ের দুর্ভিক্ষের যুগে বন্ধুবর অনাথ গোপাল সেনের প্রয়াস উল্লেখযোগ্য।

লড়াই কী চিজ

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র সুরু হইয়াছে। তখন হইতে দুনিয়ায় দেখা দিয়াছে লড়াইয়ের অর্থশাস্ত্র। তার আসল কথা সামরিক মাল, সামরিক যান-বাহন, সামরিক যন্ত্রপাতি, সামরিক খোরপোষ ইত্যাদি সব-কিছু সামরিকের উৎপাদনে বাড়্‌তি। সঙ্গে সঙ্গে অসামরিক সব-কিছুর উৎপাদনে ঘাটতি। এই দুই বাড়্‌তি-ঘাটতির অপরপিঠ হইতেছে একদিকে সরকারী লোক-

নিয়োগের হৈ-হৈ রৈ-রৈ, করাদায়ের মরশুম আর কর্জ-গ্রহণের ধুম-ধাড়াক্কা,—অপর দিকে মামুলি গৃহস্থের বরাতে তেল-নুন-ভাত কাপড়-ওষুধ-বই ইত্যাদি সব-কিছুরই অভাব অথবা আগুন দাম।

টাকা-কড়ির পরিমাণ বাড়িতেছে দেদার। "অতি-মুদ্রার" যুগ চলিতেছে। সিক্কা ফাঁপিয়া-ফুলিয়া হইল ঢোল। ইহার নাম "ইন্‌ফ্লেশন" বা সিক্কা-স্ফীতি। কঠিন শব্দ। তাহারই জুড়িদার দেখা দিয়াছে দামের চড়াই। দাম উঠিয়া ঠেকিল আস্‌মানে। ইহাকে বলিব "অতি-মূল্য" বা মূল্য-স্ফীতি।

এই সবের কোনো কিছুই "যুদ্ধের দক্ষিণায়" বাদ পড়ে নাই। অনাথবাবুর আলোচনাগুলা চিত্তাকর্ষক, যে-কোনো পাঠকের পক্ষে সরস ও শাঁসাল মালুম হইবে।

নিজের রসদ, সরঞ্জাম, মালপত্র আর লোকজন সম্বন্ধে গোমর ফাঁক করিবার মতন আনাড়ি সেনাপতি কস্মিন্‌কালেও ছিল না। একালে তো থাকিতে পারেই না। সুতরাং লড়াইয়ের খর্চা কিরূপ, কোথায়, কতটুকু বুঝা যাইবে কোথা হইতে?

আর এক কথা। লড়াইয়ে এক-তরফা জিত্‌ খাওয়া সাধারণতঃ কোনো সেনাপতির বরাতে দেখা যায় না। কাজেই সব সেনাপতির পক্ষে নিজ লোকজনের অনিষ্ট, ক্ষতি, মৃত্যু, অপমৃত্যু আর মালপত্রের বরবাত সম্বন্ধে বেশ কিছু তৈয়ার থাকা অতি-স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কোনো ম্যাড়াকান্তকে সেনাপতি করা হয় কি যে, লড়াই যখন চলিতেছে তখনই,—খোলাখুলি নিজ লোকসানের পরিমাণ সম্বন্ধে ঢাক পিটাইবে? লোকসানের কথা গাহিয়া বেড়ানো কোনো অতি আহাম্মুকেরও সত্যনিষ্ঠায় ঠাঁই পাইতে পারে না। সুতরাং লড়াইয়ের খর্চা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইতে সাহসী হয় দুনিয়ার কোন অর্থশাস্ত্রী?

কি হার, কি জিত,—লড়াই বিষয়ক সকল তথ্যই গোপনীয়।

লড়াই যতদিন চালু থাকে ততদিন এই সম্বন্ধে সংখ্যানিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ অসম্ভব। যুক্তিসঙ্গত আলোচনা আর বিজ্ঞান-মাফিক গবেষণা তখন চলিতে পারে না। লড়াই থামার কয়েক বৎসর পরে চলিলেও চলিতে পারে। (পৃঃ ২৩)। তবে তথ্যাতথ্যের কুচোকাচা এখানে-সেখানে সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। "যুদ্ধের দক্ষিণা" বইয়ে সেই সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। সংগ্রহটা সুখপাঠ্যরূপে সাজানোও হইয়াছে।

কৌটিল্য ও মাক্যাভেল্লি

লড়াই আর রাষ্ট্রনীতি চলে কৌটিল্য ঋষির পাঁতি অনুসারে। মহাভারতের কূটনীতি কৌটিল্য-দর্শনেরই মহাসাগর। ইয়োরামেরিকার কূট-দার্শনিক আসরে পূজা পায় ইতালিয়ান ঋষি মাক্যাভেল্লি। লড়াই-শিল্প আর রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বুদ্ধদেবেরও তোয়াক্কা রাখে না, আবার খৃষ্টদেবেরও তোয়াক্কা রাখে না। শত্রুকে ভয় দেখানো আর নিজের দেশকে তাতাইয়া রাখা এই হইতেছে লড়াই-নীতি আর রাষ্ট্রধর্মের একমাত্র লক্ষ্য। নিজ দেশের নরনারীকে স্বদেশ সেবায় চাঙ্গা করিয়া রাখিবার জন্য হুঁসিয়ার রাষ্ট্রবীরেরা অনেক সময় বিপদের পরিমাণটা অতিরঞ্জিত করিতেও অভ্যস্ত।

আরাকান হইতে আফ্রিকার ডাকার পর্যন্ত, আর মক্কা হইতে মস্কো পর্যন্ত ভারতীয় মালের চলাচল ঘটিতেছে। ভারতীয় মানুষও মোতায়েন আছে এশিয়ায়, আফ্রিকায় ও ইয়োরোপের ইতালিতে। এই সকল মাল ও মানুষের খতিয়ান করা লড়াইয়ের খর্চা বিষয়ক অনুসন্ধান-গবেষণা-বিশ্লেষণের অন্তর্গত। অনাথবাবুর পক্ষে এই খতিয়ানের ক্ষমতা দখল করা সম্ভব কি না লড়াই-দক্ষেরা ভাবিয়া দেখিবেন। তিনি নিজেও এই সম্বন্ধে বেশী-কিছু দাবী করেন না। (পৃঃ ৬৩, ৭২)।

সম্ভব কি অসম্ভব তাহার জন্য মাথা ঘামাইয়া লাভ নাই। "যুদ্ধের দক্ষিণা" বইয়ে যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। এই ধরণের আরও বই বাহির হইলে বাঙালীর ধনবিজ্ঞান-সাহিত্য নানা দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতে ক্রমশঃ পুষ্ট হইতে থাকিবে। কম্-সে-কম্ ধনবিজ্ঞানের রাষ্ট্রনীতি বেশ-কিছু খোলসা হইয়া আসিবে।

ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের সনাতন সুর

অনাথবাবুর "টাকার কথা" আগে পড়িয়াছি। এইবার হাতে পড়িল লড়াইয়ের খর্চা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ। বুঝিবার এবং বুঝাইবার চেষ্টা সর্বদাই বেশ নজরে পড়ে। লেখকের সকল রচনাই এক সুরে বাঁধা। ইহাকে প্রায় সর্ব-ভারতীয় অর্থনৈতিক সুর বলিতে পারি। ঠিক যেন ভারতীয় নরনারীর স্বদেশী মার্কামারা অর্থশাস্ত্র এই ধরণের রচনাবলীর ভিতর পাকড়াও করা সম্ভব।

গানের মুদ্দাটা এক কথায় নিম্নরূপ:—"বৃটিশ সাম্রাজ্যের তাঁবে আর্থিক ভারতে যাহা-কিছু ঘটিতেছে তাহার প্রায় সবটাই একপ্রকার ভারতীয় নরনারীর পক্ষে অনিষ্টকারক। ভারতের শুল্ককে শুল্ক, মুদ্রাকে মুদ্রা, শিল্পকে শিল্প, রেলকে রেল, কৃষিকে কৃষি, কর্জকে কর্জ, সবকিছুই 'কষ্টাৎ কষ্টতরং গতা' বিলাতী অর্থনৈতিক আইন-কানুনের দৌলতে।"

এই ধুআ গাহিয়াই আমরা ১৯০৫ সনে বঙ্গ-বিপ্লব সুরু করিয়াছিলাম। তাহার বৎসর বিশেক পূর্বে ভারতের ন্যাশন্যাল কংগ্রেস এই ধুআই যুবক ভারতকে ধরাইয়া ছিল। এই ধুআরই অন্যতম মূল গায়েন ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের রমেশ দত্ত। তাঁহার রচনাবলী ছিল স্বদেশী আন্দোলনের সময়কার আর্থিক ভারতের জন্য বেদ-বাইবেল-কোরাণ। এই সব গিলিয়াই আমরা মানুষ হইয়াছি। ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের সনাতন সুরে রাষ্ট্রনীতির গৎই বাজিত। আজও বাজিতেছে।

পরাধীন জাতের আর্থিক আইন-কানুন

বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনতায় ভারতবাসীকে কতকগুলা আর্থিক আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়। স্বদেশ-সেবক হিসাবে, কংগ্রেস-পন্থী হিসাবে, স্বরাজ-সাধক হিসাবে, স্বাধীনতার পূজারী হিসাবে আমরা এই সকল আইন-কানুনকে গোলামির লক্ষণ সমৃঝিতে অভ্যস্ত। আমাদের অতি সহজ বিশ্বাসে এই সব আইন-কানুন পরাধীন জাতের জন্য খাশ কায়েম করা বিধিনিষেধ বিশেষ। কিন্তু এই অধমের বিচারে সত্য কথা দাঁড়াইবে অন্যরূপ। ইয়োরামেরিকায় এবং এশিয়ায়,—অর্থাৎ দুনিয়ার বহু স্বাধীন দেশে পরাধীন ভারতের সুপরিচিত আইন-কানুনের জুড়িদার বেশ কিছু গুল্‌জার দেখিতে পাওয়া যায়। বল্কান-চক্র, বাল্টিক-চক্র, স্পেন, পর্তুগাল, ল্যাটিন্ আমেরিকা, চীন, ইরাণ তুর্কী ইত্যাদি দেশের আর্থিক গড়ন সর্বদাই নজরে রাখা উচিত। বহু বিষয়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে এই সকল দেশের আর্থিক মিল, ঐক্য, সমতা ও সাদৃশ্য আছে।

তাহা ছাড়া স্বাধীন দেশসমূহের জন্য কোনো তথাকথিত মার্কামারা স্বতন্ত্র আইন-কানুন ঢুঁড়িয়া পাওয়া কঠিন। এক এক স্বাধীন দেশের এক এক রেওয়াজ। অধিকন্তু এমন কি ফ্র্যান্স, জার্মানি, জাপান ইতালি ও বিলাতেই নানা যুগে বা নানা দশকে ভিন্ন-ভিন্ন পরস্পর-বিরোধী আর্থিক আইন-কানুন জারি হইয়াছে। কাজেই কথায়-কথায় স্বাধীন দেশের আর্থিক কর্মকৌশল হইতে পরাধীন দেশের আর্থিক কর্মকৌশলকে পুরাপুরি পৃথক বা আলাদা করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়। সোভিয়েট-রুশিয়ার কমিউনিষ্ট অর্থনীতি বিলকুল আলাদা চিজ। তাহার আলোচনা এই আসরে অপ্রাসঙ্গিক।

স্বাধীন আর পরাধীন জাতের আর্থিক ব্যবস্থায় প্রভেদ আছে বিস্তর। প্রথম কথা,—পরাধীন দেশের মাতব্বরস্থানীয় লোকেরা

সব কয়জনই বিদেশী থাকে। স্থতরাং তাহাদের খোরপোষ, পারিবারিক ভাতা, পেনশন ইত্যাদি দফায় প্রচুর টাকা বিদেশীর হস্তগত হয়। বিদেশে রপ্তানিও হয়। দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য রূপচাঁদের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর দেশকে জুতাইয়া চাবুক লাগাইয়া বড় করিয়া তোলা স্বাধীন জাতগুলার দস্তুর। তাহাদের পক্ষে সম্ভবও বটে। কিন্তু পরাধীন জাতের জন্য এইরূপ স্বদেশসেবামূলক আর্থিক কর্মকৌশল চালু করা অসম্ভব। এই জন্য বিদেশী বাদশাদের দরদ থাকিতেই পারে না। তাহাদের দরদ থাকে উল্টা দিকে। যাহা হউক এই সবই রাষ্ট্রনীতির কথা। খাঁটি অর্থনীতির ভিতর এই আলোচনা পড়ে না।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে সকল আর্থিক আইন-কামুন জারি হইয়াছে, ভারতবর্ষ স্বাধীন থাকিলেও তাহার অনেক কিছুই ভারতীয় নরনারী কায়েম করিতে বাধ্য হইত। আজ যদি ভারতবর্ষ সত্যিকার স্বরাজ পায় বা স্বাধীনতা লাভ করে তাহা হইলে কী দেখিব? দেখা যাইবে যে, বর্তমান আর্থিক আইন-কামুনের বেশ কিছু অংশ বজায় রাখা যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হইতেছে।

নতুনের ভিতর দেখা যাইবে প্রথমতঃ প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রের মাথায় ভারতীয় কৃতী ব্যক্তির দল। অধিকন্তু উঁচু কর্মচারীদের মাসিক তংখা পাঁচ ভাগের এক ভাগে নামানো হইয়াছে। আর দেখা যাইবে দেশকে অল্পকালের ভিতর যন্ত্রনিষ্ঠায়, শিল্পসম্পদে, ব্যাঙ্কগৌরবে, কৃষিদৌলতে আর বাণিজ্যবহরে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য সকল কর্মক্ষেত্রের সমবেত সাধনা।

রমেশ দত্ত'র পরবর্তী বাঙালী ধনবিজ্ঞান

রমেশ দত্ত'র অর্থনৈতিক রচনাবলীকে বঙ্গ-বিপ্লবের আর স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম বেদ-বাইবেল-কোরাণ বলিয়াছি। কিন্তু তাঁহার

চিরস্থায়ী জমিদারি বন্দোবস্ত বিষয়ক তারিফ একালে যুবকভারতের কোন্ কোন্ মহলে কল্কে পায়? ১৯২১-২৪ সনে প্রথমবারকার ইয়োরোপ প্রবাসের সময় জমিজমার আধুনিক আইনকানুন দেখিতে পাই জার্মাণিতে। বিসমার্ক-প্রবর্তিত নয়া ঢঙের জমিদারি (১৮৮০-৯) দেখিবামাত্র রমেশ দত্তকে বাতিল বিবেচনা করিতে থাকি। "ইক-নমিক ডেভেলপমেণ্ট" (১৯২৬) ইত্যাদি বইয়ে তাহার নজির আছে। আজ ফ্লাউড কমিশনের পাঁতিতে (১৯৪০) সেই বিসমার্ক ঋষির জমি-কানুন ভারতে অনেকটা কায়েম হইবার পথে আসিয়াছে। তাহার স্বপক্ষেই অর্থাৎ কংগ্রেসনায়ক রমেশ দত্ত'র বিরুদ্ধেই বলিতেছে একালের ভারতীয় স্বদেশ-সেবকগণের মতিগতি।

স্বদেশী যুগে জার্মাণ অর্থশাস্ত্রী ফ্রেড্রিক লিস্ট প্রবর্তিত সংরক্ষণ-নীতির (১৮৩০) স্বপক্ষে মেজাজ খেলিত মারাঠা 'স্বদেশসেবক' রাণাডের আর রমেশ দত্ত'র। কংগ্রেসের আবহাওয়ায় ষোল আনা সংরক্ষণনীতি ছিল তামাম ভারতের একমাত্র বাণিজ্য-নীতি। আজ ১৯৪৩ সনে ভারতের সকল স্বদেশসেবকই অর্থশাস্ত্রী হিসাবে সংরক্ষণ-শুল্কের এক্-তরফা গুণ গাহিতে রাজি আছে কি? অনেকেই ভারতীয় আর্থিক উন্নতির জন্য নানা ক্ষেত্রে অ-শুল্ক (অবাধ বা স্বাধীন) বাণিজ্যের স্বপক্ষে পাঁতি দিতে অগ্রসর। কিষাণ-প্রধান বাঙালী জাত পুরাপুরি সংরক্ষণ-নীতি বরদাস্ত করিতে পারে না।

এই ধরণের দৃষ্টান্ত বহু কর্মগণ্ডী হইতে পাওয়া যাইবে। দেশোন্নতি সম্বন্ধে ভারতীয় স্বদেশসেবকগণের অর্থনৈতিক মতামত যুগে যুগে বদলাইতেছে। আজকাল নানা স্বদেশসেবকের নানা মত। অর্থাৎ আর্থিক ভারতের উন্নতি সম্বন্ধে একটা তথাকথিত "ন্যাশন্যালিষ্ট" বা দাগ দেওয়া জাতীয়তাপন্থী মত নাই। তাহার উপর চলিতেছে কিষাণপন্থী ধনবিজ্ঞানের ধারা। অধিকন্তু আছে মজুর-পন্থী, সোশ্যালিস্ট ও রুশ-

মেজাজি অর্থনৈতিক মতওয়ালাদের দল। অন্যান্য কর্ম ও চিন্তার মতন ধনদৌলত আর অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধেও ভারতে আজ বহুত্বের জয়জয়কার।

রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার স্বপক্ষে থাকিয়াও বহু ভারত-সন্তান কংগ্রেস্-বিরোধী আর্থিক মত চালাইতেছে। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার ধুরন্ধরেরাও ভারতীয় স্বদেশী বণিক-সমিতিসমূহের অপছন্দসই অর্থনৈতিক কর্ম-কৌশলের ঝাণ্ডা খাড়া করিতেছে। রমেশ দত্ত'র পরবর্তী বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীরা ধনবিজ্ঞানের গবেষণায় তথাকথিত ভারতীয় ঐক্যের ইজ্জদ্ রক্ষা করিয়া চলিতেছে না।

লিস্ট্ প্রণীত জার্মাণ বইয়ের কিয়দংশ "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি" নামে বাংলায় ঝাড়িয়াছি বটে (১৯১৪-৩২), কিন্তু লিস্টের অর্থনৈতিক পাঁতির পুরাপুরি স্বপক্ষে উকিলি করিতে পারি নাই। তর্জমার ভূমিকায়ই আংশিকভাবে লিস্ট্-বিরোধী কথা বলিতে হইয়াছে। বিলাতী ও অন্যান্য বিদেশী পুঁজি আমদানির স্বপক্ষে এই অধমের রায় চলিতেছে অতি নির্দয় ভাবে। ভারতীয় সিক্কা ও বিনিময়ের হার সম্বন্ধে প্রায় সার্বজনিক মতের বিরুদ্ধেই মতিগতি খেলিতেছে ১৯২৫-২৬ সন হইতে। এমন কি অটাওয়া-সম্মেলনে প্রবর্তিত শুল্ক-নীতি সম্বন্ধেও আমাকে প্রায় সর্বভারতীয় মত বর্জন করিতে হইয়াছে (১৯৩৪)। বর্তমান লড়াইয়ের অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিবার সময় প্রায় সর্বভারতীয় বিচার-প্রণালী মানিয়া চলিতে পারিতেছি না। "ইকুয়েশন্‌স্ অব ওয়ার্লড-ইকনমি" (বিশ্ব-দৌলতের সাম্য সম্বন্ধ) বইয়ে (অক্টোবর ১৯৪৩) "অতি-মুদ্রা" অতি-মূল্য, লড়াইয়ের খর্চা, কর্জ বনাম কর, মার্কিণ লীজ-লেণ্ড, বিলাতী "ব্যাঙ্কর", মার্কিণ "উনিতাস" ইত্যাদি সমস্যার আলোচনা আছে। এই সকল বিষয়ে প্রায় সর্ব-ভারতীয় মতের উজান চলিতে হইয়াছে অনেক ক্ষেত্রে। অবশ্য প্রায়-সার্বজনিক পথের উল্টা পথই যে আগাগোড়া

নির্ভুল পথ সে কথা বলিতেছি না। সব কিছুই বিচারের সামগ্রী,—তর্কাতর্কির বস্তু।

অনাথ বাবুর "যুদ্ধের দক্ষিণা" বইয়ের মাল পেটে পড়িলে বাঙালী পাঠকের মহলে-মহলে টাকা-কড়ি, সরকারী আয়-ব্যয়, আন্তর্জাতিক কর্জ, কেন্দ্র-ব্যাঙ্কের কার্য-প্রণালী, মার্কিণ শিল্প-বাণিজ্য, জার্মানির অর্থকথা, আর লড়াইয়ের খর্চা সম্বন্ধে অনেক কিছু সহজে হজম হইতে পারিবে। এই সকল বিষয়ে প্রশ্নাপ্রশ্নি ও হাতাহাতি করিবার ক্ষমতাও কিছু কিছু রপ্ত হইবে। সরস ভাবে কতকগুলা তথ্য, সংখ্যা ও মন্তব্য কব্জার ভিতর পাওয়া অনেকের পক্ষেই লাভজনক সন্দেহ নাই।

পাউণ্ড ডলার ও রূপেয়া

বিলাতী পাউণ্ড-স্টার্লিঙের ঢাক্নায়, জামিনে বা আশ্রয়ে লড়াইয়ের সময়কার ভারতীয় সিক্কা চলিতেছে। এই জন্যে রূপেয়াওয়ালাদের পেটে ভয় ঢুকিয়াছে। (পৃঃ ৪৪-৪৫, ৫৮)। ভয়টা স্বাভাবিক ও ন্যায়-সঙ্গত। কেন না স্টার্লিঙের আপদ-বিপদ ঘটিলে রূপেয়া নিরাপদ থাকিবে না। জানিয়া রাখা ভাল যে, পাউণ্ডে টাকায় এইরূপ যোগাযোগ নতুন কিছু নয়। খোলাখুলি অথবা গৌণ বা পরোক্ষভাবে এই সম্বন্ধ চিরকালই চলিতেছে। (পৃঃ ৫২)।

আইনত—ভারতবর্ষ বিলাতের মফঃস্বল। ইহারই সোজা নাম বৃটিশ ভারত। ডেভনশিয়ার কেণ্ট—ল্যাঙ্কাশিয়ারের সঙ্গে লণ্ডনের যোগাযোগ যেরূপ, বাংলা, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব ইত্যাদি দেশের সঙ্গে লণ্ডনের কানুন মাফিক যোগাযোগ ঠিক সেইরূপ। কাজেই ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের দৈব-দুর্বিপাকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গায়ে আঁচড় পড়িবে না এরূপ কল্পনা করা আহাম্মুকি। মনিব দেউলিয়া হইলে গোলাম সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না। "অতি-বিপদ" সব লড়াইয়ে ঘটে না। কিন্তু

কিছু না কিছু বিপদ, কষ্ট, দুঃখ, লোকসান ঘটিতে বাধ্য। ইহারই নাম লড়াই।

যাহা হউক, বিলাতী পাউণ্ডের বিপদ ঘটা সম্ভব কি না? "অতি বিপদ" ঘটিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অন্যতম কারণ সোজা। স্টার্লিঙের সর্বনাশে ডলার-চাচাও আট্লান্টিকে ডুবিবে। এই দুই সিক্কা অনেকদিন হইতে প্রাণে প্রাণে গাঁথা রহিয়াছে। পাউণ্ডের মালিকও হাজার হাজার মার্কিণ নরনারী। স্টার্লিঙকে নিরাপদে পুষিয়া রাখা মার্কিণ রাষ্ট্রের জবর স্বার্থ। পাউণ্ড আর ডলার দুই মিঞা পরস্পর পরস্পরের দাড়ি ধরিয়া সাগর-ডুবি খাইলে তবে ভারতীয় রূপেয়া—গোলামের "ছিদ্দং"। তার আগে নয়।

সেই "ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জনের" দুরবস্থা ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবুও ধরিয়া লইতেছি যেন বিশ্বব্যাপী সিক্কা-মৃত্যু ঘটিল। তাহার মানে কী? সে হইতেছে লড়াইয়ের "অদৃশ্য", "পরোক্ষ" বা "অপ্রত্যক্ষ" খর্চা। লড়াইয়ের খর্চার সেই পরোক্ষ অংশ এড়াইয়া চলা দুনিয়ার কোনো জাতের পক্ষে পুরাপুরি সম্ভব নয়।

মার্কিণ লীজ-লেণ্ডের মারপ্যাঁচ

মার্কিণ ইজারা-কর্জ (লীজ্-লেণ্ড) বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের অন্যতম নয়া আবিষ্কার বা অবতার। এই বাবদ মাল ও যন্ত্রপাতির আমদানি দেখাইতেছে বটে; কিন্তু ইহার মারপ্যাঁচ এখনো সর্বত্র বেশ-কিছু পরিষ্কার নয়।

মার্কিণ জাতের পক্ষে পৃথিবীর দেশগুলাকে সাহায্য করিবার অন্য কোনো উপায় ছিল না। (পৃঃ ৭৬-৭৮)। তাহাতে এই সকল দেশের উপকারও হইতেছে প্রচুর। লড়াইয়ের পর ইজারা-কর্জ-ভোগী দেশগুলার পক্ষে দেনা শুধিবার পালা আসিবে। সেই অবস্থাটা বেশ-কিছু কষ্টের ও

ক্ষতির অবস্থা সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তুর্কী, ভারত, চীন, ইরাণ ইত্যাদি কৃষি-প্রধান দেশের পক্ষে এই কষ্ট অতি-মারাত্মক মালুম হইবে।

লড়াইও করিব অথচ খরচও হইবে না এমন অবস্থা কথনো ঘটে না। দুনিয়ার নানা দেশে—মায় বৃটিশ সাম্রাজ্যে,—মার্কিণ টাকাকড়ির সাম্রাজ্য কায়েম হইতে চলিল। ইহাতে ইংরেজের চোখ টাটাইতেছে। কিন্তু এই ঘটনাকে ভারতের উপর, চীনের উপর, ইরাণের উপর, বিলাতের উপর, রুশিয়ার উপর, ফ্রান্সের উপর মার্কিন জুলুম বলা চলিবে না। দুনিয়ায় "বৃহত্তর আমেরিকার" যুগ আসিতেছে। শনৈঃ শনৈঃ।

লড়াইয়ে মস্‌গুল হইয়াছ কেন? লড়াই হইতেছে রূপচাঁদের খেলা। নিজের ট্যাঁকে পয়সা না থাকিলে মাম্‌লাবাজ লোক দেনাগ্রস্ত হয়। শ্যাম-চাচা তোমাকে তোমার মামলা-মোকদ্দমার সময় কোটি কোটি টাকার মাল জোগাইয়া বাঁচাইবে। অথচ তাহাকে স্বদে-আসলে মাল বা মূল্য ফেরৎ দিবার সময় কসাই বা ইহুদি বলিয়া গালাগালি করিতে চাও? ধনবিজ্ঞানে এমন বুজরুকি চলে না। কিন্তু দুনিয়া অতি বিচিত্র—যুক্তির ধার ধারে না। মার্কিণের উপর ইংরেজের রাগ থাকিবেই। বেচারা ভারত-সন্তানের দোষ কী? আমরা তো দুনিয়ার যে-কোনো সুখী জাতের উপর চটা!

পরোক্ষ খর্চার খতিয়ান

লড়াইয়ের খর্চা খতিয়ান করিবার সময় অর্থশাস্ত্রীরা সাধারণতঃ একমাত্র নগদ টাকাকড়ির হিসাব লইতে অভ্যস্ত। এরোপ্লেনের হাম্‌লায় শহরে-পল্লীতে এবং লড়াইয়ের সাগরে বা মাঠে বহুলোক মারা যায় বা আহত হয়। তাহাদের নাকি গুণিয়া রাখাও দস্তুর। কিন্তু এই সব হইতেছে প্রত্যক্ষ বা দৃশ্য খর্চা মাত্র। (পৃঃ ৮৩-৮৬)।

তাহা ছাড়া অদৃশ্য, অপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ খর্চাও আছে। পূর্বেই

এইদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। দেশের ভিতর, লড়াইয়ের মাঠের ও সাগরের বাহিরে, অসংখ্য লোক অনাহারে দুর্ভিক্ষে মারা পড়ে। পরোক্ষ খর্চার ভিতর এই সব মৃত্যু গুণিতে হইবে। (পৃঃ ৮৬)। বহু নরনারী আধা বা সিকি বা আরও কম খোরপোষ, কয়লা ও ওষুধপত্র ইত্যাদি রসদ পাওয়ার দরুণ ব্যারামে ভোগে। এই সকল রোগীও পরোক্ষ খর্চাব অন্তর্গত।

অতি-মুদ্রা (ইন্‌ফ্লেশন) ও অতি-মূল্যের দৌরাত্ম্যে হাজাব হাজাব নির্দিষ্ট-আযের লোক দেউলিয়া ও হাভাতে-হাঘরে হয়। এই সব আর্থিক দুর্গতি, ক্ষতি ও সর্বনাশ লডাইয়ের পরোক্ষ খর্চার ভিতর পডিবে।

জার্মাণ, জাপানী, ইতালিয়ান, ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিণ, চীনা ইত্যাদি সকল জাতই আজ, কাল ও পরশু এই পরোক্ষ খর্চাই যোগাইতে বাধ্য। ভারতবর্ষও এই পরোক্ষ খর্চাই যোগাইতেছে। ভারতীয় নরনারীর বরাতে জুটিতেছে রুপৈয়ার স্টার্লিঙ-ঢাকনা, সিকাস্ফীতি, বাজারদরের অতিবৃদ্ধি, চাউলহীন বাজার-হাট, বস্ত্রাভাব, ওষুধের খাঁকতি, আর মার্কিণ ইজারা-কর্জের সুদ-আসল।

ভারতের নিকট বিলাত লডাইয়ের সময বেশ-কিছু মোটা হাবে দেনাগ্রস্ত হইল। এই দেনা বিলাত ভারতকে যথাসমযে বুঝাইয়া ফেরৎ দিবে কি? অনাথবাবুও এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। (পৃঃ ৬৫-৬৬)। ধরিয়া লইলাম যেন বিলাত এই দেনা শুধিবে না। অতএব সমঝিতে হইবে যে, এই ক্ষেত্রেও ভারতের লোকসানটা লোকসান নয়। এই দফা লড়াইয়েরই আর একটা পরোক্ষ খর্চা মাত্র।

অসামরিকদের অভিভাবক

অসামরিক লোকজনের দুর্গতি-দুর্যোগ-দুঃখকষ্টকে প্রত্যেক লড়াইয়ের পরোক্ষ খর্চাস্বরূপ মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই দিকে

রাষ্ট্রনায়কদের দায়িত্ব খুব বেশী। অসামরিক লোকজনের সুখদুঃখ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা লড়াইয়ের সময়কার মাতব্বরদের অন্যতম বিপুল ধান্ধা। এই সমস্যার জন্য চরম ব্যবস্থা করা হইতেছে বিলাতে ও জার্মাণিতে।

• "যুদ্ধের দক্ষিণা" বইয়ে সেই দিকে চোখে আঙুল দিয়া দেখানো হইয়াছে। এই প্রয়াস তারিফযোগ্য। পড়িতেছি :—"ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশে যুদ্ধের দাবী যতই সর্বগ্রাসী ও অগ্রগণ্য হউক না কেন, তথাপি সেই সব দেশের বে-সরকারী লোকের জীবনধারণোপযোগী সঙ্গত প্রয়োজনকে এভাবে এতটা পরিমাণে উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর হয় নাই।" (পৃঃ ৩২, ১১০)।

এই মন্তব্যটা নিরেট ও পাকা। ভারতীয় অর্থশাস্ত্রী ও স্বদেশ-সেবকদের গবেষণা এই দিকে বেশী-বেশী চালানো উচিত। এই সকল গবেষণার ভিতর ধরা পড়িবে বিলাতী ও জার্মাণ সমাজের আসল কাঠামো। তাহার প্রথম কথা "ডেমোক্রেসি" স্বরাজ বা গণতন্ত্র, আর দ্বিতীয় কথা সমাজ-তন্ত্র ("সোস্যালিজম")। এই দুই তন্ত্রের দৌলতেই বিলাতী-জার্মাণ অ-সামরিকেরা নিত্যনৈমিত্তিক গৃহস্থালীর জন্য যথোচিত ও দরদশীল অভিভাবক পাইয়াছে। চাই ভারতে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র।

কলিকাতা
২০ ডিসেম্বর, ১৯৪৩

বিনয় সরকার

লেখকের নিবেদন

এই লেখাগুলি প্রবাসী, শনিবারের চিঠি, আনন্দবাজার পত্রিকা (বিশেষ সংখ্যা), আর্থিক জগৎ, জয়-শ্রী প্রভৃতি সাময়িক পত্রে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বহু বিশিষ্ট পাঠকের নিকট হইতে অযাচিত প্রশংসা-পত্র লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। যুদ্ধের ইকনমিক্সের মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে আজ সকলেই কিছু জানিতে উৎসুক। কিন্তু মাতৃভাষায় কেন, ইংরেজী ভাষায়ও, ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী হইতে এই বিষয়ের আলোচনা বাংলা দেশে অতি সামান্যই হইয়াছে। সেইজন্যই চোখের সম্মুখে গোলক-ধাঁধাঁর মত দৃশ্যপটের পরিবর্ত্তন এবং সমস্ত প্রচলিত ব্যবস্থার ওলটপালট হইতে দেখিয়া সর্বসাধারণ নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ইহার পরিণাম কোথায় চিন্তা করিতেছে এবং বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ খুঁজিতেছে। এ সব বিষয়ে জানিবার তৃষ্ণা এতদূর তীব্র হইয়া উঠিয়াছে যে, এক ভদ্রলোক বিদ্‌ঘুটে অর্থশাস্ত্রের এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি পাঠ করিয়া "এ যে সরবৎ" বলিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং অপর একজন আমাকে "Royal Bengal Gokhale" উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই কথাগুলি লিখিবার উদ্দেশ্য নিজের ঢাক বাজান নহে—পাঠক সাধারণের জানিবার আগ্রহের পরিচয় দিবার জন্য এবং বাংলাভাষায় এই প্রকার আলোচনার প্রয়োজন ও সার্থকতা বুঝাইবার জন্য। সামান্য অদল-বদল করিয়া প্রবন্ধগুলিকে পুস্তকাকারে ছাপাইবার কৈফিয়ৎও ইহাই।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ও প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে ভূমিকা লিখিয়া ও প্রচ্ছদপটটি আঁকিয়া দিয়া আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। নিবেদন ইতি

৩৪৫, আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৪৩

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের নিবেদন

এই লেখাগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইবার পর যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়া থাকিলেও, পুস্তকাকারে ইহার প্রথম সংস্করণ এত শীঘ্র নিঃশেষিত হইবে, তাহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। সুধী পাঠকবর্গের নিকট তাঁহাদের এই পক্ষপাতিত্বের জন্য আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। বাঙ্গালী পাঠকবৃন্দ অর্থনৈতিক বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ এই দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন দেখিয়া আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিতেছি। দ্বিতীয় সংস্করণে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইল। ইহা মৎসম্পাদিত "ব্যবসা ও ব্যবসায়ী" মাসিক পত্রে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন স্থল বিশেষে আধুনিকতম পরিসংখ্যা দেওয়া গেল। কাগজ ও মুদ্রণের ব্যয়াধিক্য বশতঃ মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা হইল। নিবেদন ইতি

৩০২ অপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা, মার্চ, ১৯৪৪

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

সূচীপত্র

যুদ্ধের ব্যয় রহস্য

আমরা কর্তাপক্ষের কেহ না হইলেও এই সহজ সত্যটি দেখিতে পাইতেছি যে, এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধে কল্পনাতীত অর্থ জলের মত খরচ হইয়া যাইতেছে। আমরা অনেকে আবার সংবাদপত্রাদির মারফৎ ইহাও অবগত আছি যে, ইংলণ্ড এই যুদ্ধের দরুণ দৈনিক ১১ কোটি টাকা (১) ব্যয় করিতেছে এবং এই বাবদ ভারতবর্ষের ব্যয়ও দৈনিক দেড় কোটি টাকা। এই সংখ্যাগুলিকে মাসিক ও বাৎসরিক হিসাবে রূপান্তরিত করিলে যাহা দাঁড়ায় তাহা রোমাঞ্চকর সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের হিসাবটি আপাতত ধরা যাক্। প্রতিমাসে ৪৫ কোটি এবং বৎসরে ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করা ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে কিরূপ কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। অবশ্য আমাদের দেশ আকারে বৃহৎ এবং জন-সংখ্যায়ও পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু ইহার জাতীয় আয় বা লভ্যাংশের (National income or dividend-এর) কথা চিন্তা করিলে ইহার অভাবনীয় নিষ্ঠুর দারিদ্র্য হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেরই করুণার উদ্রেক করিবে। বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের বার্ষিক আয় ডক্টর রাও-এর হিসাব মত ১৬০০ কোটি হইতে ১৮০০ কোটি টাকা হইবে। এই হিসাবে ভারতবাসীর গড়পড়তা মাথাপিছু দৈনিক আয় ৶০ আনা হইতে ৶১০ আনা, মাসিক ৫৷৶০ হইতে ৬৷/০ আনা,

(১) যুদ্ধের প্রারম্ভে এই ব্যয় অনুমান করা হয়। এখন সম্ভবতঃ উহা ২৫ কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছিয়াছে।

বাৎসরিক ৬৭৸০ আনা হইতে ৭৮৶০ আনা অনুমান করা হয়। কাহারো কাহারো মতে জেলের 'নেটিভ' কয়েদীদের জন্য মাথাপিছু যে টাকা ব্যয় করা হয়, তাহা অপেক্ষাও এ দেশবাসীর স্বাধীন আয় কম।

ইংলণ্ড ছোট দেশ। আয়ার বাদ দিলে ইহার (গ্রেট বৃটেনের) লোকসংখ্যা সাড়ে চার কোটিরও কম হইবে। কিন্তু ইহার বার্ষিক আয় (৬০০০ হাজার মিলিয়ন ষ্টার্লিং) ৮০০০ হাজার কোটি টাকা। (১) এবং মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১৭৭৮৲ টাকা, মাসিক ১৪৮৲ টাকা, দৈনিক ৫৲ টাকা। প্রথমেই আমরা ইংলণ্ডের দৈনিক ব্যয়ের যে হিসাব দিয়াছি তাহাকে বার্ষিকে রূপান্তরিত করিলে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪০০০ হাজার কোটি অর্থাৎ ইংলণ্ডের মোট বার্ষিক আয়ের অর্দ্ধেক। যুদ্ধের দরুণ ভারতবর্ষও সম্ভবতঃ তাহার মোট আয়ের প্রায় অর্দ্ধেক টাকাই এই সময়ে খরচ করিতেছে। কিন্তু দুই দেশের ব্যয়ের ভিতরে পার্থক্য এই যে, ইংরেজ তাহার বার্ষিক আয় ১৭৭৮৲ টাকা ও মাসিক আয় ১৪৮৲ টাকার অর্দ্ধেক খরচ করিতেছে; আর ভারতবাসী ব্যয় করিতেছে তাহার বার্ষিক আয় ৭০৲ টাকা ও মাসিক আয় ৬৲ টাকার অর্দ্ধেক। শুধু তাহাই নহে, এদেশে পণ্যমূল্য শতকরা ৪০০ হইতে ৮০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর গ্রেট বৃটেনে সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার মাত্র ২৫ পারসেণ্ট! এখানে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে উভয় দেশের মধ্যে এই ব্যয়ের সার্থকতা কাহার পক্ষে কতখানি তাহাও বিবেচ্য। কিন্তু সেই আলোচনা অত্যন্ত অপ্রিয়, সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধের বহির্ভূত ও নিষ্প্রয়োজন।

খরচের বহর তো দেখা গেল। কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট এই বিপুল অর্থ কি উপায়ে সংগ্রহ করেন এবং ইহার চাপ কাহার

(১) যুদ্ধের আরম্ভে এই আয় ছিল। এখন যুদ্ধের অতিরিক্ত কর্ম্মপ্রবণতার দরুণ আয় আরও বাড়িয়াছে, যদিও বলা বাহুল্য ব্যয়ও তদনুপাতে বেশী হইতেছে।

উপর কিভাবে কতটা পড়ে। যুদ্ধের কতকগুলি ফলাফল প্রাত্যহিক জীবনে আমরা ভোগ করিতেছি এবং বেশ ভাল ভাবেই উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি। অবশ্য আপাতদৃষ্টিতে সকলের পক্ষে একরূপ ফল ফলিতেছে না এবং কাহারো ভাগ্যে পৌষ মাস, কাহারো বা সর্বনাশ, এই বৈষম্য বেশ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে অনেকেই যেমন পেট ভরিয়া পিঠে খাইবার সুবর্ণ-সুযোগের সন্ধান পাইয়া স্ফীত ও উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি বহু লোক কষ্টার্জিত দুমুঠা অন্নও দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার টানে হাত হইতে ফস্‌কাইয়া যাইতেছে দেখিয়া মুষড়িয়া পড়িতেছেন। অনেকে ধ্বংস ও মৃত্যুর এই ভয়ঙ্কর মন্বন্তরের মধ্যেও সুবর্ণ-গোলকের স্বপ্নে বেশ সান্ত্বনা লাভ করিতেছেন; আর মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যাহারা তাহারাও এই কর্মকাণ্ডের ভিড়ে যে যাহা পাইতেছে তাহাই লুফিয়া নিয়া কিছু দিনের মত নিশ্চিন্ত হইয়া গোঁফে চাড়া দিতেছে। দুশ্চিন্তায় আধমরা হইয়া আছে স্বল্প ও মাঝারি বেতনের চাকুরিয়া (Wage-earner), যুদ্ধের ছোঁয়াচ-হীন ক্ষুদ্র কারবারী ও ব্যবসায়ী এবং পল্লী অঞ্চলের জমিহীন চাষী ও মজুর—যাহাদের গায়ে ভীড়ের চাপ লাগিয়াছে, কিন্তু ভাগ্যে বাতাসা জোটে নাই। বেকার সমস্যা কমিয়াছে বটে, তথাপি অধিকাংশের অন্ন ও বস্ত্রসমস্যা ক্রমেই চরমে উঠিতে চাহিতেছে। শ্রেণী বা ব্যক্তি হিসাবে অনেকের (যথা, যুদ্ধের কাজে রত বড় বড় কারখানার মালিক, ঠিকাদার, আড়ৎদার, পাইকার প্রভৃতির) ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িয়া থাকিলেও দেশ বা জাতি হিসাবে ইহার পরিণাম শুভ হইতে পারে না, ইহা স্মরণে রাখিয়া এই দুর্ভাগ্যের হাটে তাঁহারা যেন নিজেদের সৌভাগ্যকে গ্রহণ করেন। কারণ—

এই সৌভাগ্যের মূলে রহিয়াছে অপরের দুর্ভাগ্য। অনেকে হয়ত বলিবেন, ইহাও সেই পুরাতন শ্রেণী-বৈষম্যের ঝগড়ার কথা। ইহার

জন্য আর নূতন করিয়া যুদ্ধকে দায়ী করিয়া কি লাভ? তাহার উত্তরে এই বলিবার আছে যে, নিখিল বিশ্বের মানব জাতির ভোগের জন্য যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ পণ্য-সম্পদ সৃষ্টি হইতেছিল, আজ তাহা প্রায় অর্ধেকে আসিয়া ঠেকিয়াছে এবং যে অর্ধেক আছে, এই যুদ্ধের দরুণ ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ধন-বৈষম্য বাড়িয়া যাওয়ায় দুর্বলের পক্ষে তাহার অংশ পাওয়া আরো কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ধনী ও দরিদ্রের ধন-বৈষম্য এবং শাসক ও শাসিতের বা প্রভু ও ভৃত্যের শক্তি-বৈষম্যকে আধুনিক কালের সর্বগ্রাসী সংগ্রাম এমন একটা অসহনীয় সীমায় লইয়া আসে যাহার ফলে ভাগ্যবানেরা স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সতর্কতা অবলম্বন না করিলে যুদ্ধশেষে দেশে দেশে অরাজকতার সম্ভাবনাকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। সেই জন্যই এই সতর্ক-বাণীর প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

দুনিয়ার সাধারণ পণ্যসম্পদ আজ অর্ধেক হইয়া গিয়াছে কেন তাহাই এখন কিঞ্চিৎ বিশদভাবে বলিবার চেষ্টা করিব। অর্থ লড়াই করে না; কিন্তু লড়াই করিবার সৈন্য-সামন্ত, গোলা-বারুদ, মাল-মসলা যোগায়। যুদ্ধের জন্য, বিশেষভাবে আধুনিক সর্বগ্রাসী যুদ্ধের জন্য, চাই অগুণতি মানুষ ও অফুরন্ত যুদ্ধের হাতিয়ার। আমরা অনুমান করিতেছি, যুদ্ধরত দেশসমূহের প্রায় অর্ধেক আয় গবর্ণমেণ্টকে যুদ্ধের দরুণ ব্যয় করিতে হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, দেশের অর্ধেক লোক আজ সর্বসাধারণের ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত না করিয়া যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গিয়াছে কিংবা লড়াই করিতে গিয়াছে। সুতরাং সাধারণ উৎপাদনক্ষেত্রে আজ অর্ধেক লোক মাত্র কাজ করিতেছে এবং তাহার ফলে জনসাধারণকে এক বৎসরের পরিবর্তে ছয় মাসের উৎপন্ন পণ্যসম্পদ লইয়া কাজ চালাইতে হইতেছে। কাগজী নোট ছাপাইয়া গবর্ণমেণ্ট দুঃসময়ে অর্থের সৃষ্টি করিতে পারেন বটে,

কিন্তু মানুষ ত ইচ্ছামত ফরমাস দিয়া গড়া বা সৃষ্টি করা যায় না। কর্মের সময় বাড়াইয়া দিয়া, বেকার দলকে কাজে লাগাইয়া, অবসর-প্রাপ্ত বৃদ্ধ বা স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া নূতন কর্ম-ক্ষেত্রের অপরিসীম অভাবের অতি অল্প পরিমাণই দূর করা সম্ভবপর হয়। তাই সাধারণ কর্মক্ষেত্র হইতে অভিজ্ঞ মানুষের ডাক পড়ে এই নূতন ক্ষেত্রে; এবং বৃহত্তর প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদের আসিতে হয়। যাহারা থাকিয়া যায় তাহাদের উৎপাদনের বড় একটা অংশ যুদ্ধের জন্যই টানিয়া লওয়া হয়। ফলে, আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের ক্ষেত্রে কড়া টান পড়ে।

তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যুদ্ধের প্রয়োজন ও সাধারণ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজন, দুই-ই সমানভাবে মেটান কখনো সম্ভবপর নয়। যুদ্ধের অনির্বাণ চিতার কাঠ জোগাইতে হইলে রন্ধনশালার কাঠের অনটন অবশ্যম্ভাবী। অন্যথা উদ্যোগ-পর্বের প্রয়োজনের সহিত শান্তি-পর্বের প্রয়োজনের লাঠালাঠি অত্যন্ত রূঢ় ও কঠোর হইয়া দাঁড়াইবে। এইজন্যই আপোষে ভোগের অন্ন কিছু কম করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেন্ট সর্বক্ষণ আমাদিগকে এই অযাচিত উপদেশ দিয়া চলিয়াছেন—"পয়সা খরচ করিও না, হাত গুটাও, অর্থ সঞ্চয় কর।" ভাষান্তরে, "বাজারে জিনিষ কম, তুমি আর উহাতে লোভ করিও না; বরঞ্চ ঐ টাকা সঞ্চয় করিয়া আমাকে দাও।" অন্যথা ধনীরা অর্থের জোরে যে-কোন মূল্যে তাদের শান্তি-পর্বের ষোল আনা ভোগ এই সময়ে সংগ্রহ করিতে সুরু করিলে গরীবের উপর চাপ পড়িবে আরো বেশী এবং গবর্ণমেন্টকে মিষ্টি কথা পরিত্যাগ করিয়া হয় অর্ডি-ন্যান্সের বল-প্রয়োগ দ্বারা সাধারণের কলকারখানা দখল ও লোক সংগ্রহ করিতে হইবে, নয়ত নোট মুদ্রণ ও ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় ক্রেডিট বৃদ্ধি দ্বারা অর্থ-স্ফীতি (inflation) ঘটাইয়া ধনী প্রতিদ্বন্দ্বীদের

পরাজিত করিতে হইবে। প্রথম পন্থাটি অপ্রিয়কর। দ্বিতীয়টির যুদ্ধোত্তর পরিণাম অত্যন্ত অহিতকর এবং বহুবিধ বিশৃঙ্খলার আকর। সুতরাং দুইটি পন্থাই যথাসম্ভব পরিত্যাজ্য, যদিও যুদ্ধের অপরিহার্য চাপে উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা অসম্ভব। গত মহাযুদ্ধে অর্থ-স্ফীতির দরুণ কুফল পরবর্তীকালে ভোগ করিয়া সকল গবর্ণমেণ্টই (১) এবার এ সম্পর্কে বেশ হুঁসিয়ার হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাই ইচ্ছামত নূতন অর্থ-সৃষ্টি (inflation) না করিয়া ইহারা জনসাধারণকে মিতব্যয়ী হইতে উপদেশ দিতেছেন এবং তাহাদের উদ্বৃত্ত তহবিলের একটা বড় অংশ ট্যাক্স ও ঋণের সাহায্যে সংগ্রহ করিতেছেন। যুদ্ধকালীন অর্থ-নীতির মূল উদ্দেশ্য হইতেছে, জনসাধারণের ভোগের পরিমাণ হ্রাস করা। ট্যাক্স আদায় ও ঋণ গ্রহণ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের হাত হইতে খরচের পূর্বেই অর্থ টানিয়া লয়েন; পক্ষান্তরে, গবর্ণমেণ্ট নূতন অর্থ সৃষ্টি করিলে সর্বসাধারণ পূর্বের মতই অর্থ ব্যয় করিবার সুবিধা পায় বটে; কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিহেতু পূর্বের সমপরিমাণ ভোগসামগ্রী ক্রয় করিতে পারে না। যুদ্ধকালীন অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্যই যদি হয় সর্ব-সাধারণকে যথাসাধ্য ভোগ হইতে বিরত রাখা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায় যদি হয়, মানুষের হাতের টাকা যতটা সম্ভব টানিয়া লওয়া ও জিনিষের মূল্য যতটা সম্ভব চড়াইয়া দেওয়া, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় জিনিষ খরিদের বেলায় তিন গুণ চার গুণ মূল্য দিতে হইতেছে বলিয়া কলরব ও কলহের সৃষ্টি করা বুদ্ধিমানের দৃষ্টিতে নিতান্তই ছেলেমানুষী কাজ। কারণ আমরা যে জিনিষ সস্তা পাইবার জন্য দাবী করিতেছি তাহার একটা বড় অংশ (আমাদের হিসাবে প্রায় অর্ধেক) যুদ্ধের প্রয়োজনে পূর্বেই গবর্ণমেণ্টকে আমরা দিয়া বসিয়া

(১) একমাত্র ভারত গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত।

আছি এবং সেই জিনিসগুলির মূল্য দিবার জন্যই আমরা এখন গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স ও ঋণের মারফতে অর্থ জোগাইতেছি।

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক কথাতেই আমাদিগকে আসিতে হইবে—আমাদের জন্য টাকা লড়িতেছে না, লড়িতেছে মানুষ ও জিনিষ—যে মানুষ ও জিনিষ অন্য সময়ে আমাদের অভাবমোচনের কর্মে নিয়োজিত হইত। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যাহা দিতেছি তাহা টাকা নহে, ভোগের পণ্য। কাজেই লড়াইও করিব, আবার পূর্ব মূল্যে সকল জিনিস সমান পরিমাণে ভোগও করিব, ইহা একেবারেই অসম্ভব—যেমন অসম্ভব to eat the cake and have it.

তবে কি যুদ্ধের অপরিহার্য স্বার্থত্যাগের মধ্যে ভাল-মন্দের কোন বিচার নাই কিংবা সামান্য মুস্কিলাসানেরও কোন অবকাশ নাই? নিশ্চয়ই আছে। কঠিনতম সমস্যার মধ্যেই ত অধিকতর দূরদৃষ্টি ও দক্ষতার পরিচয় দিবার সুযোগ রহিয়াছে। কিন্তু সেই সুযোগ যুদ্ধের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের তরফে যাঁরা অর্থ জোগান তাঁদের হাতে ততটা নয়, যতটা যাঁরা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য মানুষ ও জিনিসকে দেশের সাধারণ পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্র হইতে টানিয়া আনিয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োগ করেন তাঁদের হাতে। তাঁরা যদি হৃদয়বান, দূরদর্শী ও সুদক্ষ হন তবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প লোক ও জিনিস দ্বারা অধিকতর কার্যকরী ও শক্তিশালী যুদ্ধ-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে পারিবেন এবং ফলে দেশবাসীর উপর অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বর্জন করিবার দাবী কম হইবে। পক্ষান্তরে, তাঁহারা যদি ক্ষুদ্রচেতা ও অকর্মণ্য হন, এবং 'লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন' এই মনোবৃত্তি লইয়া যুদ্ধের সময় সাত-খুন-মাপ জ্ঞানে বেপরোয়া ও যথেচ্ছভাবে মানুষের ও জিনিষের অপ-ব্যবহার করিতে থাকেন, তাহা হইলে সাধারণ লোকের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব ও তাহাদের মূল্য দুই-ই বাড়িতে

থাকিবে। এইখানেই দূরদৃষ্টি, দক্ষতা ও হৃদয়ের পরিচয় দিবার বিরাট ক্ষেত্র এবং তাহারই অভাবে আমাদের আজ এরূপ দুরবস্থা।

আর যাঁহাদের উপর টাকা সংগ্রহের ভার, সত্য বটে তাঁহাদের দায়িত্ব জাতির সমষ্টিগতভাবে কতখানি আত্মত্যাগ করিতে হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণে নহে; পরন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতির এই সমগ্র ত্যাগকে কিভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে তাহা নির্ধারণে। এই ক্ষেত্রে যুদ্ধের দুর্ভাগ্যের মধ্যেও দুর্বল ও দরিদ্রের জন্য খানিকটা দুঃখ-কষ্টের লাঘব সম্ভবপর, যদি শক্তিমান ও ধনীর ভাগে ত্যাগের পরিমাণ ন্যায্য পরিমাণে চাপান যায়। কিন্তু তাহা কি হইতেছে?

এইখানে ট্যাক্স আদায়, ঋণ গ্রহণ ও নূতন অর্থ সৃষ্টি, এই তিনটি বিভিন্ন উপায়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রহিয়াছে। যথা, তিনটির মধ্যে কোন্‌টির ব্যবহার কখন কি পরিমাণ করা সমীচীন; দরিদ্রকে যথাসম্ভব বাঁচাইয়া কেবল ধনীর নিকট হইতে ট্যাক্সের দ্বারা যুদ্ধের খরচ কতটা উঠিতে পারে; সেই ট্যাক্স কিরূপ ও কতটা হইবে; ট্যাক্স আদায় ও ঋণ গ্রহণের মধ্যে কোন্‌টি অধিকতর শ্রেয়ঃ; নূতন অর্থসৃষ্টি কিভাবে কতটা করা যাইতে পারে; অবিবেচনামূলক অতিরিক্ত অর্থ-সৃষ্টির বিপদ কি ইত্যাদি সম্পর্কে পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

কর, ঋণ ও ইন্‌ফ্লেশন

যুদ্ধকালীন অর্থনীতির মারপ্যাচ না জানিলেও, আমরা দেখিয়া শুনিয়া ও ঠেকিয়া ইহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি যে, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অসংখ্য মানুষ ও জিনিসের মূল্য দিবার অর্থ গবর্ণমেণ্ট সংগ্রহ করেন প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে; যথা, কর-নির্ধারণ, ঋণ-গ্রহণ ও নূতন অর্থ-সৃষ্টি (inflation)। ইহাদের সঙ্গে একটি ফেউ বা ফাও আছে, তাহার নাম চাঁদা অর্থাৎ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দান। বর্ত্তমান সময়ে যুদ্ধের দরুণ ইংলণ্ড ২৫ কোটি টাকা ও ভারতবর্ষ প্রায় ১১/২ কোটি টাকা দৈনিক ব্যয় করিতেছে, এইরূপ আমরা সাময়িক পত্রিকাদি হইতে অনুমান করিতে পারি, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে, উভয় দেশই এই বাবদ নিজ নিজ দেশের বার্ষিক আয়ের (national income or dividendএর) প্রায় অর্দ্ধেক টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করিতেছে। বার্ষিক আয় বলিতে সেই দেশের বার্ষিক মোট উৎপাদনের মূল্য (value of total physical output) বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, গ্রেট ব্রিটেনের বার্ষিক আয়ের সহিত ভারতের বার্ষিক আয়ের কোনো তুলনাই হইতে পারে না। গ্রেট ব্রিটেন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনশালী দেশ। আর ভারতবর্ষের অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত; প্রসারে ও গভীরতায় এই দেশের লোকের দারিদ্র্যের তুলনা অন্যত্র মেলা ভার। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

আমরা যে কথা বলিতেছিলাম; জাতীয় আয়ের অর্দ্ধেক টাকা যুদ্ধের দরুণ ব্যয় করার অর্থ এই যে, আমরা জাতীয় উৎপাদনের

অর্ধেকই যুদ্ধের জন্য দান করিতেছি। অর্থাৎ যাহারা পণ্যোৎপাদন বা দেশের সম্পদ সৃষ্টি করে, তাহাদের অর্ধেক নরনারীই আজ যুদ্ধের কর্মে নিয়োজিত, এবং সেই জন্যই সাধারণের ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিসের বেলায় আজ এতটা টানাটানি। কারণ ইহার অর্ধেকই আজ লোপ পাইয়া যুদ্ধের জন্য স্থানান্তরিত বা রূপান্তরিত হইতেছে। তাহা হইলে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে, যুদ্ধের ব্যয় যতই বাড়িতে থাকিবে সাধারণের ব্যবহার্য মোট জিনিসের অভাবও ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং মূল্যও ততই চড়িতে থাকিবে। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, মূল্য চড়িবে কেন? তার উত্তর এই যে, যুদ্ধের জন্য যত মানুষ ও জিনিসের প্রয়োজন তাহা আমরা স্বেচ্ছায় ত্যাগ বা দান করিতে প্রস্তুত নই। যদি প্রকাশ্য নীলামে জিনিস বিক্রয়ের মত গবর্ণমেণ্ট ও সর্বসাধারণের মধ্যে দেশের মোট পণ্য-সম্পদ ও শ্রম-সম্পদ নিয়া ডাক চলিতে থাকে, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত এক পক্ষে গবর্ণমেণ্ট ও অপর পক্ষে শক্তিশালী ও ধনীদের মধ্যে পাল্লা চলিবে এবং গরিবকে বহু পূর্বেই নিরাশ হইয়া ডাক ক্ষান্ত করিতে হইবে। শেষাঙ্কে, গবর্ণমেণ্টের নোট ও ক্রেডিটের নিকট ধনীদিগকেও আংশিক পরাজয় স্বীকার করিয়া ভোগের দাবী কিঞ্চিৎ হ্রাস না করিলে চলিবে না। কিন্তু এই শোকে সান্ত্বনা পাইবেন তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক সৃষ্ট ও ব্যয়িত নূতন টাকার একটা মোটা অংশ লাভ করিয়া। ভোগের শোক টাকার স্বপ্নে তাঁহারা হয়ত একেবারেই ভুলিবেন; কিন্তু যাহারা অতিরিক্ত অর্থও পাইতেছে না, অথচ শুধু অন্ন-বস্ত্রের জন্য তিন-চার গুণ মূল্য দিতেছে তাহাদের সান্ত্বনা কোথায়? তাঁহারা যদি দেশপ্রেমিক হন, তবে তাঁহাদের একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, যুদ্ধের যজ্ঞে দরিদ্র হইলেও তাঁহাদের ত্যাগই সর্বাধিক। আসল কথা হইতেছে, যুদ্ধ যখন পুরাদমে চলিতে সুরু করে, তখন দেশে বেকার নরনারী

কিংবা অকেজো জিনিস কিছুই পড়িয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু: সমস্ত গ্রাস করিয়াও যখন গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধকালীন দারুণ ক্ষুধা মিটিতে চাহে না, তখন সর্বসাধারণের ভোগ-সামগ্রীর উপর ভাগ বসাইতে হয় এবং তার জন্য মূল্য চড়াইয়া দিয়া একটা বিরাট মানব-সমাজকে বঞ্চিত না করিয়া উপায় থাকে না। সেই জন্যই এই সব বৃহৎ যুদ্ধের সময় ভোগপ্রবৃত্তি ও ব্যয়-প্রবণতাকে দমন করিতে হয়, অন্যথা অর্থ-স্ফীতি (inflation) ঘটাইয়া পণ্য-মূল্য চড়া করিয়া দিয়া এই উদ্দেশ্য সফল করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর ইন্‌ফ্লেশনের মারাত্মক কুফল দেশে দেশে এমন পরিস্ফুট হইয়া উঠে যে বর্তমান যুদ্ধে কার্যতঃ দায়ে পড়িয়া যে যাহাই করুন না কেন, মুখে কিন্তু ইহার নাম উচ্চারণ করিতেও কেহ সাহস পাইতেছেন না। [এই সম্পর্কে ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে]

ইনফ্লেশনের দুর্গুণ সম্বন্ধে এখানে একটু বিশদভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, ইহা ধনীদের স্বার্থহানি অপেক্ষা গরিবদের ক্ষতি অধিক পরিমাণে করিয়া থাকে, অধিকন্তু উচ্চ মূল্য দ্বারা ইহা ধনীদের ধনোপায়ের সুযোগ ও সুবিধা বর্ধন করে, এবং গরিবদের স্বল্প আয় হইতে একটা অংশ অপহরণ করে। কি প্রকারে তাহার আভাস পূর্বেই খানিকটা দিয়াছি। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পণ্য-মূল্য যদি মাত্র দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াও ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সকলের ভোগ-সামগ্রী অর্ধেক হ্রাস পাইয়াছে অনুমান করিলেও দুই কারণে দরিদ্রের প্রতি অন্যায় অবিচার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, মূল্য দিবার ক্ষমতা সম্পর্কে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে তাহার প্রতি ইহা দৃষ্টিপাত করে না। দ্বিতীয়তঃ, ধনীদের ভোগ-সামগ্রীর বিরাট বহর

হইতে ত্যাগের যে পরিমাণ সুযোগ আছে, দরিদ্রের তাহা নাই। সুতরাং উভয়ের উপর সমান স্বার্থত্যাগের দাবী করিতে হইলে দরিদ্রের তুলনায় ধনীর অনেক বেশী ভোগ-সামগ্রী পরিহার করা কর্তব্য। ইহাকেই অর্থশাস্ত্রে ক্রমবর্ধমান নীতি (Progressive principle) বলা হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য অবস্থায় এই নীতির গুরুতর ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে। অধুনা সর্ববাদিসম্মত ক্রমবর্ধমান নীতি দ্বারা বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, প্রত্যেক ইংরেজ তাহার গড়পড়তা ২০০০৲ টাকা (আনুমানিক) বার্ষিক আয় হইতে যুদ্ধের জন্য যদি অর্ধেক ব্যয় করে, তাহা হইলে ভারতবাসীকে তাহার বার্ষিক আয়ের অর্ধেকের বহু কম ব্যয় করিতে হয়। কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তাহার বার্ষিক পড়পড়তা আয় ১০০৲ টাকার অধিক নহে; অর্থাৎ ইংরেজের ১/২০ অংশ মাত্র। একই দেশের বিভিন্ন অবস্থার লোকের মধ্যেও ত্যাগের এই ক্রমবর্ধমান নীতি অনুসৃত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইন্‌ফ্লেশন প্রায় তেলা মাথায় তৈল দান করিয়া ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ইন্‌ফ্লেশনের একটি মস্ত গুণ আছে। আর্থিক জগতে মরীচিকার মায়াজাল বুনিয়া ছলনা দ্বারা যদি লোককে ঐশ্বর্য-বিভ্রান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার মত এমন ম্যাজিক দেখাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। যুদ্ধের আকস্মিক কর্ম-প্রবণতার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিহেতু ব্যাঙ্ক-ক্রেডিট অনেকটা আপনি বাড়িয়া চলিতে থাকে। তার উপর নূতন নোট ছাপিবার মুদ্রাযন্ত্র আসিয়া যোগদান করে। ফলে বাজারে টাকার অত্যধিক ছড়াছড়ি হইয়া এক দিকে মুদ্রামূল্য কমিতে ও পণ্যমূল্য চড়িতে থাকে; অন্য দিকে অনেকের শূন্য পকেট (অত্যধিক লাভ বা প্রফিটিয়ারিঙের দরুণ) এই সময়ে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং পূর্ণ পকেট ছিঁড়িয়া পড়িবার মত হয় এবং চারিদিকে

একটা কর্মব্যস্ততা ও প্রাচুর্যের হাওয়া বহিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই মিথ্যা ঐশ্বর্যের বহিঃচাকৃচিক্যের মধ্যেও একদল মানুষ যে ঠাকুর পূজার উচ্চ-দক্ষিণা দিয়াও ভোগের প্রসাদ পায় নাই এবং নিরুপায় হতাশার মধ্যে দিন কাটাইতেছে ইহার জন্য ভাবিবার বড় একটা অবকাশ যুদ্ধের দুর্দিনে কাহারও হয় না। সুতরাং বৃহৎ ব্যাপারের দীয়তাং ভুজ্যতাং ডাকহাঁকের নীচে ইহাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপা পড়িয়া যায় এবং মোটের উপর বাহিরে বেশ একটা উল্লাসের সুর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। যাহারা এই মহাযজ্ঞে উৎসর্গের জন্য চিহ্নিত, তাহারাও ফুল, বেলপাতা ও চন্দনের পূজা লাভ করিয়া বলির কথা প্রায় ভুলিয়া যায় এবং অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইবার সাহস লাভ করে। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ অর্থনীতিবিদ মিঃ কেইন্‌স্ সত্যই বলিয়াছেন :—It (inflation) greatly benefits some important interests. It oils the wheels everywhere, and a regime of rising wages and profits spreads an illusion of prosperity. (অর্থাৎ ইহা কতকগুলি বৃহৎ কায়েমী স্বার্থের বিশেষ উপকার সাধন করে, সকল চরকাতেই খানিকটা তৈল দান করে, এবং ঊর্ধ্বগামী মজুরি ও লাভের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া চারিদিকে সম্পদের একটা কুহেলিকা বিস্তার করে) এইখানেই ইহার গুণের শেষ নহে। ইহার সব চেয়ে বড় গুণ হইতেছে, ইহার জন্য কাহাকেও ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না, স্পষ্টতঃ কাহাকে দায়ী করাও চলে না। ইহা অনেকটা নির্দায়িত্বে ও নিশ্চেষ্টায় স্বকাজ সাধন করে, এবং এই জন্যই এই অর্থ-সম্প্রসারণ নীতির প্রতি রাষ্ট্রপতিগণের একটা সহজাত আনুকূল্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গত যুদ্ধে ইহার শেষ ফল চিন্তা করিয়া অর্থ-শাস্ত্রের এই লোভনীয় গোপন কলা-কৌশলটির অপপ্রয়োগ পরিহার করিয়া চলিবার চেষ্টা এবার প্রথম দিকে সকলেই

করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়। এক দিকে সাপে কাটিবার, অপর দিকে বাঘে খাইবার আশঙ্কা ঘটিলে একেবারে সম্মুখে যে মৃত্যু-দূত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলাই যেমন স্বাভাবিক, তেমনি এক্ষেত্রেও যুদ্ধের সম্মুখ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আগ্রহে ভবিষ্যৎকে ইহারা কতটা বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেছেন তাহা জানেন যবনিকার অন্তরালে যাঁহারা কাজ করিতেছেন তাঁহারা—আর জানেন ভগবান। আমরা বাহিরের ফলাফল দেখিয়া খানিকটা আঁচ করিতে পারি মাত্র। সম্প্রতি আমাদের দেশে পণ্য-মূল্য যেভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সত্যই আশঙ্কাজনক। ইংলণ্ডে ও অন্যান্য যুদ্ধরত দেশে তদনুপাতে পণ্যমূল্য আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই বলিলেও সম্ভবতঃ অত্যুক্তি হইবে না। গত যুদ্ধের পর জার্মানীর আর্থিক অবস্থা আজ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গল্পের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবাধ নোট প্রচলন বা অর্থ-স্ফীতির ইহা চিরদিন "ক্লাসিক্যাল" দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে। এই দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের গবর্ণমেণ্টের সময় থাকিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। যুদ্ধের পর জার্মানীর মুদ্রা প্রথমে শুধু কাগজের বস্তায়, পরে ব্যাঙ্কের খাতার অঙ্কে পর্যবসিত হইয়া এমনি মূল্যহীন হইয়া গিয়াছিল যে এক পেয়ালা চা পান করিতে হইলে সেখানে এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) মার্ক দিতে হইত। যুদ্ধের পূর্বে বা প্রারম্ভে যাঁহারা ব্যাঙ্কে লক্ষ মার্ক জমা রাখিয়া ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যুদ্ধের পরে দেখা গেল তাহার মূল্য একটি কাণাকড়ি মাত্র। ইহার ফলেই সেখানে "ন্যাশন্যাল সোশ্যালিজ্‌ম্‌" ও নাৎসীবাদের উদ্ভব। যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় ফ্রান্সের অবস্থা এত দূর গড়ায় নাই সত্য, কিন্তু মুদ্রামূল্য সেখানেও ৪ অংশ হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার ফলে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দলাদলি সুরু হয়, যাহার জন্য আজ তাহাকে অভাবনীয়

অপমান ও পরাজয়ের কলঙ্ককালিমা মাথায় তুলিয়া লইতে হইয়াছে। যুদ্ধের সময় সর্বসাধারণ কর্তৃক পণ্যের চাহিদা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া সর্ব-প্রথম প্রয়োজন, এবং এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই ইন্‌ফ্লেশনের সহজ পন্থা অবলম্বন করিয়া, নোট ছড়াইয়া ও ক্রেডিট বাড়াইয়া পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু এই পথের শেষ কোথায় তাহা আমরা দেখিয়াছি। সুতরাং এই 'আপাত মধুর পরিণামে বিষ' ফলের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমাদিগকে শেষ পর্যন্ত যথাসম্ভব inflation-এর পথ এড়াইয়া চলিতে হইবে। (১)

কিন্তু তাহার পূর্বে মানুষকে মহাত্মা ভাবিয়া একটি কাল্পনিক আদর্শ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যাক্। আমরা গোড়াতেই দেখিয়াছি, যুদ্ধের জন্য বাহ্যত গবর্ণমেণ্টকে আমরা অর্থ দান করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তন্মূল্যের ভোগ-সামগ্রীই দিয়া থাকি। আমরা ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদের মোট আয়ের অর্ধেক টাকা যুদ্ধের জন্য ব্যয় করার অর্থ হইতেছে আমাদের ভোগ-সামগ্রীর অর্ধেক ব্যয় করা। এই যদি অবস্থা হয়, তাহা হইলে যুদ্ধের সময় আমরা আমাদের অভাবকে স্বেচ্ছায় যতই সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে পারিব, ততই যুদ্ধকালীন সমস্যাকে সরল করিয়া আনা হইবে। বলা বাহুল্য, গরীবের পক্ষে ভোগের প্রান্তসীমা এমনি অতি সঙ্কীর্ণ। সুতরাং ত্যাগের দায়িত্ব তাহাদেরই তত বেশী যাহাদের ভোগের পরিমাণ যত বেশী। এই নীতি মানিয়া লইয়া দেশের সকল লোক যদি আপন ইচ্ছায় তাহাদের অবস্থানুযায়ী (অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান নীতি অনুযায়ী) ভোগ-বিলাস পরিহার করিয়া চলে এবং এই ব্যয়-সঙ্কোচের দরুণ তাহাদের যে-অর্থ

(১) এক বৎসর পূর্বে, প্রবন্ধ লিখিবার সময়, ইন্‌ফ্লেশনের কারচুপি যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, এবং বাহিরেও তাহার ভয়াবহ ফলাফল পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই; কর্তৃপক্ষ তখনও ইন্‌ফ্লেশন অস্বীকার করিতেছিলেন।

বাঁচিবে তাহা গবর্ণমেণ্টকে দান করে কিংবা কর-স্বরূপ দেয়; তাহা হইলে যুদ্ধের দরুণ দেশের লোকের উপর মোট দাবীর পরিমাণ হ্রাস না পাইলেও এই দাবী সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে; কারণ এরূপ অবস্থায় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পাইবার কোনো কারণ ঘটিবে না এবং তদ্দরুণ যুদ্ধ-কালীন এক দল পকেটমারেরও সৃষ্টি হইতে পারিবে না। শুধু যুদ্ধের নিমিত্ত দেশের যে অর্ধেক লোক ও জিনিসের প্রয়োজন তাহার উপর আমাদের দাবী গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট যাহাতে মূল্য দিয়া সেই মানুষ ও জিনিস পাইতে পারেন তজ্জন্য আমাদের বার্ষিক খরচ হইতে এইভাবে উদ্বৃত্ত অর্ধেক টাকাটাও উহাকে দিয়া দিতে হইবে। ইহার জন্য ধনীদের বহু রকমের খেয়াল ও বিলাস বর্জন এবং দরিদ্রদিগকে তাহাদের সামান্য সম্বল হইতে আরও কিছু পরিহার করিতে হইবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ত্যাগের ক্রমবর্ধমান নীতি যদি ঠিকমত প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ অবস্থানুযায়ী কাহাকে কি পরিমাণ ত্যাগ করিতে হইবে ইহা যদি ঠিকমত নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে ধনীরা শাঁখের করাতের মত যাইতে আসিতে উভয় দিকে আর কাটিতে পারিবেন না, এবং ঘোরতর শ্রেণী-বৈষম্যের অনাচার ও পিত্তজ্বালা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিবে-না।

এখানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই ব্যবস্থাতেও নূতন অর্থ-সৃষ্টি (inflation) একেবারে বাদ দিয়া চলা সম্ভবপর হইবে না। কারণ যুদ্ধের পূর্বকার উৎপাদন অপেক্ষা যুদ্ধ সময়ের উৎপাদন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং এই অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব হয় বেকার বা অবসরভোগী নরনারীর নিয়োগ ও অব্যবহৃত নৈসর্গিক সম্পদ হইতে। সুতরাং এই বর্ধিত সম্পদ বা সরঞ্জামের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়; কিন্তু তাহার সৃষ্টিতে কোনো দোষ

হয় না। কারণ এই ক্ষেত্রে মোট পণ্য-সম্পদের অনুপাতে মোট অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না এবং তজ্জন্য পণ্য-মূল্যের বৃদ্ধি কিংবা মুদ্রামূল্যের হ্রাস ঘটিতে পারে না। প্রকৃত ইনফ্লেশন তাহাকেই বলা হয় যে অর্থ দেশবাসীর ভোগ সঙ্কোচের দরুণ তাহাদের সঞ্চয় হইতে প্রাপ্ত নয় কিংবা যাহা বর্ধিত পণ্যোৎপাদনের হারকে ছাড়াইয়া যায়। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, যুদ্ধের ব্যয় বহন করিবার জন্য এমন একটি পরিকল্পনা করা যায় যাহাতে পণ্যমূল্য চড়ক গাছ ও মুদ্রামূল্য ধরণীপাত হইবে না, যাহার ফলে রাতারাতি ধনী ও রাত্রি-শেষে ফকির হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, যাহাতে ধনীর সুযোগ ও গরিবের দুর্যোগ আর অধিক বৃদ্ধি পাইতে পারিবে না, পরন্তু ধনীকে সত্যই কষ্ট অনুভব করিবার মত ত্যাগ স্বীকার করিতে হইলেও গরিবের আসনেও নামিয়া আসিতে হইবে না।

কিন্তু এই কল্পনানুযায়ী কাজ হইবার পক্ষে দুইটি বাধা আছে—তার মধ্যে প্রথমটি হইতেছে, মানুষের ষড়রিপুর অন্যতম—লোভ। মানুষ তাহার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে যতদিন শুভ বুদ্ধি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া স্বেচ্ছায়, অথবা রাষ্ট্রদ্বারা অনুশাসিত হইয়া অনিচ্ছায়, সমষ্টির মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইতে না দিবে, তত দিন সে সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই নিজের কোলে ঝোল টানিতে চেষ্টা করিবে। কেহ মনে করিবেন না আমি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিপক্ষে কিছু বলিতেছি। আমার বলিবার বিষয় এই যে, পরোপকারই মানুষের ধর্ম এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ করাই মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য, ইহা যদি আমরা জীবনে পালন করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে মানব-সমাজে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া তর্কের বা বিরোধের কোনো অবকাশই থাকে না। যাহা হউক, এই আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্তন করা যাক্। মানুষের ধাতুগত এই

লোভ ও স্বার্থপরতাকে অনেকটা দমন করিয়া ভাগ্যবান ও দুর্ভাগাদের মধ্যে নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার রাষ্ট্রের পক্ষে খানিকটা সম্ভবপর বটে, কিন্তু সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র, এই বিপরীত দুইটি সামাজিক আদর্শের মধ্যে কোন্ আদর্শে কোন্ রাষ্ট্র গঠিত তাহার উপর এই নিরপেক্ষ নীতির আন্তরিক ও ব্যাপক প্রয়োগ বিশেষভাবে নির্ভর করে। আমাদের জীবনমরণ সংগ্রামে রুশিয়া আজ সর্বাপেক্ষা বড় সহায় ও আশা-ভরসাস্থল হইলেও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আদর্শে ইহা হইতে আমরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আমরা অ্যাংলো-আমেরিকান কর্তৃত্বাধীনে গণ-তন্ত্রের পতাকাবাহী ধন-তন্ত্রীর দলে। সুতরাং আমরা যে আদর্শ পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছি তাহাকে আপোষে কিংবা রাষ্ট্রের শাসনে কোনো প্রকারেই পুরাপুরি কাজে লাগান সম্ভবপর নহে। তথাপি ইহার অনুকূলে জনমত যে ধীরে ধীরে আজ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার কারণ হইতেছে এই যে, ধনতান্ত্রিকদের মধ্যেও অনেকেই আজ বুঝিতে পারিতেছেন, এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে ইহাকে যথাসম্ভব গণযুদ্ধে পরিণত করিতে হইবে। সেই জন্যই আইনের অনুশাসনে ও অর্থের লোভে লোকাভাব বা পণ্যাভাব না ঘটিলেও, উৎপাদনক্ষেত্রে কিম্বা সমরক্ষেত্রে শক্তি পরীক্ষার সময়ে দেশাত্মবোধ-শূন্য, আদর্শহীন, বেতনভোগী শ্রমিক ও সৈনিকের সাহায্যে যুদ্ধ জয় করা যাইবে কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় বর্তমান যুদ্ধে অন্যান্য দেশে খুশিমত অর্থ-বৃদ্ধি করিয়া ধনবৈষম্য না বাড়াইয়া প্রধানতঃ করের সাহায্যে যুদ্ধের টাকা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিয়াছে, এবং কর নির্ধারণের বেলায়ও ধনীদের উপর পূর্বাপেক্ষা অধিক নজর দেওয়া হইতেছে। ইহা দ্বারা আমাদের আদর্শের পিণ্ডরক্ষা হইতেছে সত্য, কিন্তু শেষরক্ষা হইতেছে না নিশ্চয়ই।

আমরা যে প্রথম বাধাটির কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা মানসিক, দুর্লঙ্ঘ্য হইলেও বুদ্ধির দিক দিয়া অলঙ্ঘ্য নহে। কিন্তু দ্বিতীয় বাধাটি একেবারে অলঙ্ঘ্য, যদি যুদ্ধের ব্যয় এত দূর পর্যন্ত গড়ায় যে দেশের সকল লোক দীনোপযোগী জীবনযাত্রার সংস্থান রাখিয়া অবশিষ্ট সব দান করিবার পরেও টাকার অকুলন হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থা সকল ব্যবস্থা বা চিকিৎসার বাহিরে—যথেচ্ছ ঋণ গ্রহণ, কর-আদায়, এমনকি ইন্‌ফ্লেশন, কোন কিছুতেই আর তখন শেষরক্ষা হইতে পারে না এবং সেই দেশের তখন ভাঙিয়া পড়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। এরূপ অবস্থা যে আমাদের নিছক কল্পনা না-ও হইতে পারে তাহার প্রমাণ গত যুদ্ধে জার্মানী আমাদিগকে ভাল করিয়া দিয়াছে। অধুনা এ দেশে অত্যাবশ্যক পণ্যমূল্য যেভাবে চড়িয়াছে তাহার আশু প্রতিকার যদি করা না যায় তাহা হইলে আমাদের বর্তমান ত গিয়াছেই, ভবিষ্যৎও অন্ধকার।

যতক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ-ব্যয়-বহন দেশের সাধ্যায়ত্ত ততক্ষণ পর্যন্তই কোন্ ব্যবস্থা কম অহিতকর কিংবা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত তাহা দেখিবার প্রয়োজন বা সার্থকতা থাকে। সাধ্যাতীত অবস্থায় পথের বিচার নিষ্প্রয়োজন। সুতরাং সময় থাকিতে সাধ্যায়ত্ত অবস্থায় কোন্ পথে চলিতে হইবে তাহাই আমাদের বিচার্য। ইন্‌ফ্লেশনের বিষয় পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এখন কর-আদায় ও ঋণ-গ্রহণ এই দুইটির গুণাগুণ ও ভেদাভেদ সংক্ষেপে বিচার করিতেছি। প্রথম কথা, মানুষ কর দেওয়া পছন্দ করে না, কিন্তু ধার দেওয়া পছন্দ করে। তাহার কারণ কর বাধ্যতামূলক, ও প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি বিহীন। কিন্তু ধার স্বেচ্ছামূলক (১) ও সুদসহ পরিশোধনীয়। দ্বিতীয় কারণ, কর হইতেছে কণ্টিকারীর কাঁটা, অতি সুস্পষ্ট, কোনরূপ অন্তরাল নাই—

(১) অবশ্য বাধ্যতামূলক হইতে পারে, যথা, Compulsory saving.

ঔষধের গুণ থাকিলেও সোজা গিয়া মর্মে বিদ্ধ হয়। আর ধার হইতেছে গোলাপের কাঁটা, বাহিরে লোভনীয়, অন্তরে কণ্টকাকীর্ণ। ইহা ধনীকে প্রলুব্ধ করিয়া, বর্তমানকে লোভ দেখাইয়া, ভবিষ্যতের অদৃষ্টকে বাঁধা রাখে। ইহাই হইল আনাড়ীর দৃষ্টিতে বাহ্যিক প্রভেদ, কিন্তু পণ্ডিতের অন্তর্দৃষ্টিতে দুইয়ের মধ্যে নাকি কোন প্রভেদ নাই। কারণ দুইয়েরই উদ্দেশ্য হইতেছে—দেশবাসীর হাত হইতে অর্থ টানিয়া নিয়া তাহাদের খরচের বহর খাটো করা এবং সেই অর্থ দ্বারা সর্ব-সাধারণের ভোগ হইতে গৃহীত মানুষ ও জিনিসগুলিকে লড়াইয়ে নিয়োজিত করা। (আমরা দেখিয়াছি inflation জিনিসের মূল্য চড়াইয়া দিয়া এই উদ্দেশ্যই সাধন করিবার চেষ্টা করে।) যে পরিমাণ টাকা গভর্ণমেণ্ট কর কিংবা ঋণ বাবদ গ্রহণ করিতেছেন, উভয় ক্ষেত্রেই সেই পরিমাণ টাকার ভোগ-সামগ্রী হইতে দেশবাসীকে মোটের উপর বঞ্চিত হইতে হইতেছে।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, ঋণকে বিশ্লেষণ করিলে শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায়—ঋণ = ভবিষ্যৎ কর + সুদ = গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্। ফলের দ্বারা বিচার করিলে ঋণ হইল এক প্রকার বর্ণচোরা কর, যাহা বর্তমানের বোঝা ভবিষ্যতের উপর চাপাইয়া ভাবী-মানবের জন্য কর-শয্যা বিছাইয়া যায়। এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহের দরুণ আজ পর্যন্ত ভারতের (১) ও অন্যান্য দেশের ঋণের অঙ্ক এমন আকার ধারণ করিয়াছে যে তাহার জের টানিতে গিয়া মানুষের মাথা বিকাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে এবং অনেক জাতির পক্ষে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া দাঁড়ান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এক কলমের খোঁচায়, ইহাদিগকে শেষ করিয়া ফেলিয়া নূতন খাতায় জীবনের নূতন

(১) ভারতের সরকারী ঋণের পরিমাণ এই যুদ্ধের পূর্বে ১২০৩ কোটি টাকা ছিল।

পরিচ্ছেদ সুরু করিতে পারিলে মানুষ বাঁচিয়া যাইত; কিন্তু পুঁজিবাদীদের ইহাতে বিষম আপত্তি। তাই ইহাদের পৃষ্ঠপোষিত অর্থ-শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ জাতির ভাল-মন্দের বিচার করিবার সময় সমষ্টিগত মঙ্গলামঙ্গলের দ্বারাই উহার বিচার ও নিয়ন্ত্রণ করেন। কিন্তু তাহার অন্তরালে, এমনকি তাহারই চাপে, যদি বৃহত্তর শ্রেণীর মঙ্গল নিষ্পেষিত হইয়াও যায় তথাপি পারতপক্ষে উহা বিবেচনা করেন না। কিন্তু শ্রেণী-বৈষম্য হেতু সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সংঘর্ষ আজ এমন একটা পরিস্থিতিতে মানব জাতিকে লইয়া চলিয়াছে যে, এখন শুধু সমগ্রভাবে একটা দেশ বা জাতির মঙ্গলামঙ্গল দেখিলেই চলিবে না, তাহার অন্তর্ভুক্ত সকলের হিতাহিত যাহাতে সমভাবে বিবেচিত ও সুরক্ষিত হয়, তৎপ্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুতরাং অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেশের বা জাতির মোট স্বার্থত্যাগ, কর ও ধার এই উভয় বিধানে সমান হইলেও, বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, না, ধনীর তুলনায় দরিদ্র অধিক ক্লেশ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহাও যথাসম্ভব দেখিতে হইবে।

সেই দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে, কর অপ্রিয় হইলেও সর্বাপেক্ষা অনুকূল ও সাম্যবাদী—যদি কর্তৃপক্ষের অনুরূপ উদ্দেশ্য থাকে। পক্ষান্তরে ধার ধনীর পৃষ্ঠপোষক; কিন্তু সেই ধার যদি বিদেশ হইতে করা হয়, তাহা হইলে অধমর্ণ দেশের ধনী-নির্ধনের অবশ্য একই অবস্থা দাঁড়ায়। সকল দিক বিবেচনা করিয়া সর্বাপেক্ষা উপযোগী হইলেও করের বিপদ এই যে, প্রত্যক্ষ আয়-করই হউক, কিংবা পরোক্ষ পণ্য-শুল্কই হউক, দিবালোকের মত ইহার নিষ্ঠুর নিরাভরণতা ধনী-দরিদ্র সকলকেই উত্যক্ত করিয়া তোলে এবং ইহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় সহ্য বা হজম করিবার শক্তি ও মনোবৃত্তি কাহারও নাই। সেই জন্যই আধুনিক কালের কল্পনাতীত সামরিক ব্যয় শুধু করের সাহায্যে সংগ্রহ

করা বিত্তশালী দেশের পক্ষেও কষ্টসাধ্য, এমন কি অসাধ্য—যদি ইহার তিক্ততাকে ঋণ ও ইনফ্লেশনের মিষ্টরসের সহিত পাক দিয়া খানিকটা সরস ও সহনীয় করিয়া না লওয়া হয়। (১) ইহার ভিতরেও সেই বৈদ্যেরই বাহাদুরি সর্বাপেক্ষা অধিক যিনি রোগীর অবস্থা বুঝিয়া প্রত্যেক অনুপানের মাত্রা ঠিক করিয়া এই পাঁচন তৈরি করিতে পারেন। এই সম্পর্কে বৈদ্যকে ইহাও বিশেষভাবে দেখিতে হইবে যে, যুদ্ধের প্রবল আক্রমণ হইতে রোগী কোন রকমে রক্ষা পাইবার পরে শান্তির হাওয়া লাগিয়া যেন মারা না পড়ে।

অবশ্য সব চেয়ে বড় সমস্যা হইয়াছে, সব রকম বিধানের সম্মিলিত প্রয়োগ করিয়াও যুদ্ধের সময়কার আর্থিক ফাঁড়া কাটাইয়া উঠা। কারণ এই লড়াই, যতই দিন যাইতেছে ততই দেখা যাইতেছে, বীরের লড়াই নহে, টাকার লড়াই, রূপান্তরে, জল-জাহাজ, উড়ো-জাহাজ, সাঁজোয়া গাড়ী, বর্ম গাড়ী, কামান-বন্দুক, গোলা-বারুদের লড়াই—এক কথায়, যন্ত্র-দানবের লড়াই। যে যত অধিক পরিমাণ ও শক্তিশালী মারণ-যন্ত্র সৃষ্টি করিয়া সমরক্ষেত্রে ছাড়িতে পারিবে, তাহার তত জয়ের সম্ভাবনা বাড়িয়া যাইবে। মানুষও এই যন্ত্রেরই একটা অংশমাত্র। সুতরাং যুদ্ধ যখন নির্দিষ্ট দেশের ও স্থানের সীমানা অতিক্রম করিয়া ক্রমে ক্রমে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে তখন এক পক্ষ তড়িৎবেগে স্থানবিশেষে জয় লাভ করিলেও যুদ্ধের শেষ মীমাংসা হয় না এবং যুদ্ধের ফলাফল তখন শৌর্যের উপর ততটা নির্ভর না করিয়া যন্ত্র-সরঞ্জামের প্রাচুর্যের উপর

(১) ভারত সরকার গত বৎসর মার্চ মাসে যে বাজেট পেশ করেন তাহাতে এই বৎসর (১৯৪৩-৪৪) ৬৫ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ষ শেষে প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ ৯২'৪৩ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। আগামী বর্ষে (১৯৪৪-৪৫) ঘাটতির পরিমাণ ৭৮২১ কোটি টাকা অনুমান করা হইয়াছে। বর্ষ শেষে সম্ভবতঃ ইহা পূর্বের মতই অনুমানকে অনেক ছাড়াইয়া যাইবে।

নির্ভর করে। শৌর্য ও কর্মকুশলতা গৌণভাবে অনেকটা সহায়তা করে নিশ্চয়ই; কিন্তু শেষরক্ষা শুধু তাহাতে হয় না,—যদি না তাহার সহিত থাকে দীর্ঘ দম। এই দীর্ঘ দম নির্ভর করে দীর্ঘ টাকার থলির উপর, আর দীর্ঘ টাকার থলি নির্ভর করে প্রচুর মানুষ ও প্রভূত ভূমির কর্তৃত্বের উপর। সেই জন্যই আজ নিরীহ, নির্বিরোধী দেশগুলিরও যুধ্যমান কোনো দেশের কবল হইতে এই যুদ্ধে নিস্তার নাই। বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর গ্রেট ব্রিটেন, বিপুল স্বর্ণাধিপতি যুক্তরাষ্ট্র ও অপূর্ব শৌর্যশালী রুশিয়ার সহিত জার্মানী ও জাপানের এত দিন লড়াই করা অসম্ভব হইত, যদি জার্মানী ইয়োরোপের অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশ এবং জাপান দূর প্রাচ্যের নৈসর্গিক সম্পদে পরিপূর্ণ বিস্তৃত ভূখণ্ড প্রথম দিকে বিদ্যুৎবেগে নিজ অধিকারে আনিতে সক্ষম না হইত। বিপুল বিশ্বের সব গ্রাস করিয়াও যুধ্যমান দেশ কয়টি এই মহা নর-মেধ যজ্ঞের ব্যয় বহন করিতে হিমসিম খাইয়া যাইতেছে। আজ যদি ইহাদিগকে শুধু নিজের দেশের লোক ও সম্পদ লইয়া লড়িতে হইত, তাহা হইলে কবে এই কালান্তক যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়া সব চুকিয়া যাইত। কিন্তু তাহা করিতে হয় নাই বলিয়াই রঙ্গমঞ্চের শেষ যবনিকা এখনও পড়ে নাই। তবে ইহা অনুমান করা কঠিন নহে যে, আমরা এই বিষম বিয়োগান্ত নাটকের পঞ্চমাঙ্কে এখনও না আসিয়া থাকিলেও চতুর্থ অঙ্কে নিশ্চয়ই পৌছিয়াছি। কারণ, যেমন দেখা যাইতেছে, যজ্ঞকাষ্ঠ যোগাইবার ক্ষমতার প্রান্তসীমা হইতে কেহই আর বড় বেশী দূরে নাই। রাম না হইতে রামায়ণ রচনা করা বাল্মীকি-প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু উহা নিয়ম-বহির্ভূত। তাই এই যুদ্ধের ব্যয়-রহস্যও নাটকের পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হইবে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, এরূপ ব্যয়-সাপেক্ষ যুদ্ধ, এসিয়ায় না হইলেও, ইয়োরোপে ১৯৪৪ সালে শেষ হইবেই; কারণ

তত দিনে যুদ্ধের দক্ষিণা দিবার উপায় নির্ধারণ সম্বন্ধে সকল পণ্ডিতের সকল পাণ্ডিত্যকে সম্ভবতঃ হার মানিতে হইবে। এখন আমরা শঙ্কিত-চিত্তে শুধু ইহাই ভাবিতে থাকিব—মানব জাতির দশা সেই সময়ে ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ না হয়।

ইন্‌ফ্লেশন, না স্বর্ণমৃগ

অর্থশাস্ত্রের একটি প্রধান সূত্র হইল, অর্থের সংখ্যাতত্ত্ব (quantity theory of money)। এই তত্ত্বের মূল কথা হইল—প্রত্যেক জিনিসের মূল্য যেমন উহার যোগান ও চাহিদার আপেক্ষিক পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তেমনই টাকার মূল্যও নির্ভর করে তাহার যোগান ও চাহিদার উপর। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাক। আমরা জিনিসের মূল্য সর্বদা নিরূপণ করিয়া থাকি টাকার মাপকাঠির দ্বারা, এবং তাহা করিতে গিয়া জিনিসের মূল্য বাড়িতেছে, কি কমিতেছে, ইহাই শুধু দেখিতে পাই; কিন্তু তখন আমরা এ কথা ভাবি না যে, টাকারও একটা মূল্য আছে; এবং তাহার মূল্য বাড়িতেছে, কি কমিতেছে, তাহার বিচার হয় জিনিসের মাপকাঠির দ্বারা। সুতরাং আমরা যখন বলি, জিনিসের মূল্য বাড়িয়াছে, তাহার অর্থ হইল—টাকার মূল্য বা ক্রয়-শক্তি কমিয়াছে। তেমনই জিনিসের মূল্য হ্রাস পাইয়াছে বলিলেও টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই যে টাকার মূল্য বা ক্রয়-শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি, ইহা তাহার যোগান ও চাহিদার আপেক্ষিক পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যখন কোন বিশেষ দ্রব্যের যোগান হ্রাস বা চাহিদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার মূল্য বৃদ্ধি পায়, কিংবা যোগান বৃদ্ধি বা চাহিদা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া তাহার মূল্য হ্রাস পায়, তখন তাহার দ্বারা কিন্তু টাকার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সূচিত হয় না—যদিও সেই বিশেষ পণ্যটির খরিদের বেলায় টাকার ক্রয়-শক্তির তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু যদি একই সময়ে প্রায় সকল জিনিসের বেলাই মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস লক্ষিত হইতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—টাকার ক্রয়শক্তির সত্যই হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, অর্থাৎ টাকার

চাহিদা অপেক্ষা যোগান বাড়িয়াছে, অথবা যোগান অপেক্ষা চাহিদা বাড়িয়াছে।

এখানে প্রশ্ন হইবে, টাকার আবার যোগান ও চাহিদা কি? টাকার সংখ্যা কি বাড়ানো ও কমানো যায়? আর যদি চাহিদার কথা বলেন তবে বলিব, আমরা সকলেই তো ইহার উপাসক, সারা জীবন তো ইহারই জন্য ওত পাতিয়া বসিয়া আছি। সুতরাং ইহার চাহিদার আবার আদি-অন্ত বা সীমা-পরিসীমা কি? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলিব, টাকার সংখ্যা ইচ্ছামত বাড়ানো ও কমানো যায়, প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে। একটি উপায় হইতেছে, দেশের ব্যাঙ্কে যে সর্বসাধারণের কোটি কোটি টাকা গচ্ছিত থাকে, ব্যাঙ্ক সেই টাকা নানা কাজে অনেক লোককে ধার দেয়। এই ধারের পরিমাণ বাড়ানো ও কমানো ব্যাঙ্কেরই হাতে। যদি ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ সময়ে এই ঋণদানের পরিমাণ বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত টাকা বাজারে উপস্থিত হইয়া প্রাচুর্যের সৃষ্টি করিবে। সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাগ্যচক্র যখন উর্ধ্বগামী হয়, তখন দেশের ব্যবসায়ী ও কারবারীগণ তাঁহাদের ব্যবসার প্রসার ও উন্নতির সুযোগ বুঝিয়া মহাজন বা ব্যাঙ্কের নিকট ধারের জন্য অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হইতে থাকেন এবং তাহারাও সেই সময়ে অনেকটা নিঃশঙ্কচিত্তে উহাদিগকে অধিকতর পরিমাণে দাদন দিয়া থাকে এবং এইভাবে দেনা বা ব্যাঙ্ক-ক্রেডিটের মারফতে বাজারে বহু টাকার আমদানি হইয়া চলতি অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। টাকা বাড়াইবার দ্বিতীয় উপায় হইল—দেশের গবর্মেণ্ট বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অধিক পরিমাণে কাগজী নোট ছাপাইয়া বাজারে সেইগুলি চালাইতে শুরু করে। প্রয়োজন হইলে এবং ইচ্ছা করিলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই আবার বাজার হইতে অতিরিক্ত অর্থ তুলিয়া বা সরাইয়া লইতেও পারে। কিন্তু সেই সকল কলাকৌশল এখানে আলোচ্য

নহে। বর্তমান সময়ে আমরা যাহা দেখিতেছি, তাহা হইতেছে এই যে, মহাজন, ধনী, ব্যাঙ্ক ও সরকারী ছাপাখানা নিজ নিজ সিংহদ্বার দিলদরিয়া মেজাজে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। বিশ্বগ্রাসী যুদ্ধের এই মহাযজ্ঞের হোমানলে একটা কিছু আহুতি দিয়া বরলাভের জন্য সকলের আহ্বান আসিয়াছে। সচল, অচল, খাঁটি, মেকী বলিয়া আজ আর মানুষ বা জিনিসের মধ্যে বিশেষ বাছবিচার নাই। এই একটানা উচ্ছ্বাসের বাজারে বুদ্ধিমান ও উদ্যোগী পুরুষগণ দুই হাতে টাকা ছড়াইয়া দশ হাতে দশগুণ করিয়া উহা লুটিয়া লইতেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কি পরিমাণ অর্থ অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া এইভাবে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার নির্ভরযোগ্য হিসাব অবশ্য আমরা দিতে পারিতেছি না, কারণ তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের হিসাব ভিন্ন অন্য ব্যাঙ্ক ও মহাজনী দাদনের হিসাব পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে, যুদ্ধের প্রারম্ভে বহু টাকা যেমন ভয় পাইয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল, পরবর্তী মরসুমে তদপেক্ষা অধিকতর টাকা তাহাদের বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাজারে আসিয়া পশরা খুলিয়াছে। এই টাকার সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও যুদ্ধের এই চারি বৎসরে কি পরিমাণ নূতন নোট বাজারে বাহির হইয়াছে, তাহা দেখিলেই অর্থ-স্ফীতির একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারা যাইবে। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত বাজারে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৯ কোটি টাকা। ১৯৪৪—জানুয়ারী পর্যন্ত উহা ৮৬০ কোটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সুতরাং যুদ্ধের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত প্রায় ৭০০ কোটি টাকার নূতন নোট সৃষ্টি হইয়াছে!

টাকা যোগানের বহর তো দেখা দেখা গেল। এখন টাকার চাহিদা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। টাকার প্রয়োজনই টাকার চাহিদা। সেই প্রয়োজন শুধু 'ইচ্ছা হয়ে মনের মাঝারে' থাকিলেই

চলিবে না। ভোগের পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিবার জন্যই তাহার প্রয়োজন। দুনিয়ায় যদি টাকাই শুধু থাকিত, আর ভোগের সকল সামগ্রী অন্তর্ধান করিত (বর্তমান যুদ্ধের বাজারে এ দেশে যাহা ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে) তাহা হইলে শুধু অর্থ লইয়া মানুষের কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হইত? কারণ মানুষ তো আর অর্থ নামক পদার্থটিকে চর্বণ করিয়া বা পরিধান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিত না। সুতরাং অর্থের প্রকৃত চাহিদা নির্ভর করে দেশের মোট বিক্রয় বা হস্তান্তরযোগ্য ভোগ-সামগ্রীর উপর। এই ভোগ-সামগ্রীর মধ্যে মানুষের বুদ্ধি ও শ্রম-সম্পদকে ধরিতে হইবে; কারণ তাহাও অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে হয়। তাহা হইলে টাকার মূল্য তাহার যোগান ও চাহিদার উপর নির্ভর করে বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কোন একটা বিশেষ সময়ে বাজারে মোট চলতি টাকা ও মোট বিক্রয় বা হস্তান্তরযোগ্য পণ্যের সংখ্যার দ্বারা ইহার মূল্য (পক্ষান্তরে পণ্যমূল্য) নিরূপিত হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভোগ-সামগ্রী বলিতে আমরা যদি এখন শুধু চাউলকেই ধরিয়া লই, এবং আজ যদি কলিকাতার বাজারে ২০ লক্ষ মণ চাউল বিক্রয়ের জন্য মজুত থাকে, আর মানুষের হাতে থাকে একুনে এক কোটি টাকা, তাহা হইলে চাউলের দর হইবে মণ-করা ৫্ টাকা। কিন্তু যদি টাকার সংখ্যা বাড়িয়া ২ কোটি বা কমিয়া ৫০ লক্ষ হয়, অথচ চাউলের পরিমাণ সমানই থাকে, তাহা হইলে চাউলের দর যথাক্রমে ১০্ ও ২৷৷০ টাকা হইবে। পক্ষান্তরে, টাকার সংখ্যা যদি এক কোটিই থাকিয়া যায়, অথচ চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৫ লক্ষ বা হ্রাস পাইয়া ১০ লক্ষ মণ হয়, তাহা হইলে চাউলের দর যথাক্রমে ৪্ টাকা ও ১০্ টাকা দাঁড়াইবে। ইহারই নাম টাকার সংখ্যাতত্ত্ব।

তাহা হইলে শেষসিদ্ধান্ত ইহাই দাঁড়াইল যে, জিনিসের মূল্য নির্ভর

করে দেশের মোট টাকা ও মোট পণ্য-সম্পদের আপেক্ষিক সংখ্যার উপর। তাই প্রত্যেক দেশের কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রধান কর্তব্য হইতেছে, অর্থের ও পণ্যের এই সম্পর্ক স্থির রাখিয়া পণ্যমূল্য যথাসম্ভব ঠিক রাখা। কারণ পণ্যমূল্য যদি অর্থের ক্রয়শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি হেতু প্রায়শ পরিবর্তনশীল হয়, তাহা হইলে দেশের উৎপাদক (Producer) ও খাদক (Consumer) উভয়ের অবস্থাই অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কোন কাজকর্ম করা অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং সমগ্র ব্যাপার একটা জুয়াখেলায় পরিণত হয়। অকস্মাৎ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইলে পণ্যোৎপাদকের অপ্রত্যাশিত লাভ হইবে সত্য, কিন্তু অন্য দিকে নির্দিষ্ট আয়ের পণ্যভোগীদের ভাগ্যে অকারণ বঞ্চনা লাভ লইবে। এই অবস্থায় উত্তমর্ণদেরও ক্ষতি হইবে, কিন্তু অধমর্ণদের সুবিধা হইবে। কারণ ধার করিবার সময় টাকার যে মূল্য ছিল, তদপেক্ষা এখন উহার মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় অধমর্ণগণ কম মূল্যের টাকা দিয়া ঋণমুক্ত হইতে পারিবে। দৃষ্টান্ত—এক ব্যক্তি কিছু কাল পূর্বে ৫৲ টাকা ধার করিয়া ১ মণ চাউল ক্রয় করিয়াছিল। কিন্তু চাউলের মূল্য এখন ৪০৲ টাকা হওয়ায় সে তাহার মহাজনকে ৫৲ টাকা ফেরত দিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু সে ॥৵০ আনা বা ৫ সের চাউল মাত্র দিয়া রেহাই পাইতেছে। এইরূপ অবিচার ও অনাচার বন্ধ করিবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম, জীবন-যাত্রাকে অনিশ্চিত জুয়ার দান হইতে একটা সুশৃঙ্খল হিসাবের মধ্যে আনিবার জন্যই প্রত্যেক দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্যেন-দৃষ্টি লইয়া নিজ নিজ দেশের ভিতর পণ্য-সংখ্যার সহিত অর্থ-সংখ্যার হার ঠিক রাখিয়া পণ্যমূল্যের ওঠা-নামা যথাসাধ্য নিবারণ করাই ইহাদের প্রধান কাজ। পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া মূল্য হ্রাসের সূচনা হইবামাত্র তদনুযায়ী টাকার সংখ্যা বাড়াইয়া দিবার ভার ইহাদেরই উপর, আবার পণ্যোৎপাদন হ্রাস পাইয়া

মূল্য চড়িবার লক্ষণ দেখা গেলে বাজার হইতে অতিরিক্ত টাকা তুলিয়া লইবার দায়িত্বও ইহাদেরই। আর্থিক ব্যাপারে বহু মার খাইয়া অনেক রকমে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া, শত বৎসর আন্দোলন করিবার পর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নামক একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আমাদের ভাগ্যে লাভ হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার চারি বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া অভাবনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার তাল সামলানো বিদেশী সরকারের আওতায়, যুদ্ধনৈতিক অবস্থার চাপে, এই ব্যাঙ্কের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর হইল না। তাহার প্রমাণ, এই দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইয়াছে, পরদেশমুখাপেক্ষী, জার্মান ব্লিৎস-বিধ্বস্ত, যুদ্ধের অন্যতম প্রধান নটরাজ ইংলণ্ডেও তদনুরূপ কিছুই হয় নাই।

কেন এইরূপ হইল? এই প্রশ্নের উত্তর উল্লিখিত সূত্রের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। এক দিকে পণ্য-সম্পদ হ্রাস, অন্য দিকে অর্থস্ফীতি (inflation) এই একাভিমুখী দুইটি ধারার যুগপৎ সম্মিলন এই অবস্থার জন্য দায়ী। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, যুদ্ধের দরুণ চারিদিকে তো ভয়ানক কর্মব্যস্ততা দেখিতেছি, দিবারাত্রি তো কলকারখানার কাজ চলিতেছে, এ অবস্থায় উৎপাদন হ্রাস পাইবে কি করিয়া? তাহার উত্তর হইতেছে, মানুষের ভোগ-সামগ্রীর উৎপাদনই আমাদের বিবেচ্য, বর্তমানে চারিদিকে অহোরাত্রি যে কীর্তন চলিয়াছে, তাহা সর্বসাধারণের পণ্যসম্পদসৃষ্টির লীলা-কীর্তন নহে, যুদ্ধের গোলা-বারুদ সাজ-সরঞ্জাম তৈয়ারির পালা। আমাদের দেশের কলকারখানায়, ক্ষেত-খামারে যাহারা সর্বসাধারণের ভোগের পণ্য নির্মাণ করিত, তাহাদের অধিকাংশ আজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যুদ্ধের পালা-কীর্তনে লাগিয়া গিয়াছে। তদুপরি বিদেশ হইতে সাধারণের ব্যবহার্য যে সব পণ্য-সম্ভার আসিত, তাহাও আজ যুদ্ধের দাবি মিটাইবার জন্যই বন্ধ।

সুতরাং এই মহাযজ্ঞে দেশের অসংখ্য বিবাগী ও বেকারের একটা গতি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ ভোগ-সামগ্রীর হাটে পণ্যের যোগান অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে, কিন্তু চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে কল্পনাতীত। কারণ গবর্মেণ্ট তাহার বিরাট ক্রয়শক্তি লইয়া সেই হাটে সাধারণ খরিদ্দারের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত হইয়াছে। সর্বপ্রকার পণ্যেব উপরই তাহার দাবি, এবং সেই দাবির সীমা-পরিসীমা নাই এবং মূল্যেরও লেখাজোখা নাই। এই দাবির অপরিসীম শক্তির পরিমাপ করিতে হইলে ভারত গবর্মেণ্টের যুদ্ধের দরুণ ব্যয়ের অঙ্কের দিকে আমাদের একবার দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এই যুদ্ধের পূর্বে ভারত গবর্মেণ্টের সামরিক ব্যয়ের বরাদ্দ ছিল বার্ষিক ৬০।৬৫ কোটি টাকা। কিন্তু এই প্রলয় নাচন শুরু হইবার পর প্রতি মাসেই প্রায় এই পরিমাণ টাকা ব্যয় হইতেছে। তাহা হইলে এখন বৎসরে ৬০।৬৫ কোটি টাকার স্থলে ভারত গবর্মেণ্টের ৬০০।৭০০ কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে, এবং এই টাকা জিনিস ও মানুষ কিনিতেই ব্যয় হইতেছে। এত বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত পাল্লা দিয়া আমাদের আত্মারাম ঠাকুরকে দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখা কি আমাদের মত ভদ্রলোকের সাধ্য—যদি না প্রভুপক্ষ আমাদের উপর একটু কৃপাদৃষ্টি রাখেন?

আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা যেন সেই কৃপাদৃষ্টি হইতে কিঞ্চিৎ বঞ্চিত হইয়াছি। হইবারই কথা। কিছুকাল যাবৎ আমাদের অনেকের আচরণ ও চালচলনের মধ্যে সাবালকোচিত পাকামি বা জ্যাঠামি প্রকাশ পাইতেছিল। যুদ্ধের এইরূপ সঙ্কটকালে এতাদৃশ আচরণ উপেক্ষা করা চলে না। তাই সম্ভবতঃ আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সহবৎ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্যথা এ দেশে অন্ন-বস্ত্রের সমস্যা এতদূর গড়াইতে পারিত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশে যুদ্ধের দাবি যতই সর্বগ্রাসী ও অগ্রগণ্য হউক না কেন, তথাপি সে সব দেশে সাধারণ বেসরকারী লোকের জীবন-

ধারণোপযোগী সঙ্গত প্রয়োজনকে এভাবে এতটা পরিমাণ উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভবপর হয় নাই। যুদ্ধের এই ভীষণ অবস্থার মধ্যেও ইংলণ্ড বিপদসঙ্কুল সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া বিদেশ হইতে খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া, দেশবাসী সকলের অভাব যথাসাধ্য মোচন করিতেছে, আর আমাদের দেশে বিদেশ হইতে পণ্য আমদানি তো বহু দূরের কথা, অর্ধভুক্ত ও অর্ধ উলঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোকের মুখের গ্রাস ও পরিধানের বস্ত্র কিছুদিন পূর্বেও কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছানুযায়ী বিদেশে চালান দেওয়া হইয়াছে। দেশের ভিতরেও এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, এমন কি নিজের জমির ধান ও খনির কয়লা আনাইবার আবশ্যক হইলে রেলে জাহাজে কোথাও এতটুকু স্থান পাওয়া পর্যন্ত দুঃসাধ্য। গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত কাজের বাহিরে কিছুই হইবার উপায় নাই। সর্বত্রই যুদ্ধের দোহাই! কিন্তু যুদ্ধের এই দোহাই তো যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার জন্য; কিন্তু জয়ের বহু পূর্বেই, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহু দূরে থাকিয়াও, যদি আমাদিগকে এখনই দল বাঁধিয়া গঙ্গাযাত্রা করিতে হয়, তবে এই দোহাই কাহার জন্য বা কিসের জন্য? এ সহজ প্রশ্নটি যে উঠিতে পারে, তাহা আমাদের প্রভুবংশ অবগত নহেন, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই; কিন্তু অন্যবিধ কারণ ইহা অপেক্ষাও প্রবল। সে বিষয়ে পরে আলোচনা করিতেছি।

এখন পূর্ব আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করা যাক। যুদ্ধারম্ভের পর ৭০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত নোট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাজারে ছাড়িয়াছেন, ইহা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই ৭০০ কোটি টাকার নোট কোথা হইতে কি ভাবে আসিল? এই নোটের পশ্চাতে কি পৃষ্ঠপোষকরূপে স্বর্ণ কিংবা অন্য কোনরূপ মূল্যবান সম্পদ নাই? ইহা কি শুধুই কাগজের নোট, যাহা গবর্ণমেণ্ট (যুদ্ধের

ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য অন্য কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া) যদৃচ্ছা ছাপাইয়া আমাদের পণ্য ও শ্রম-সম্পদ ক্রয় করিতেছেন? এসব প্রশ্নের উত্তর হইতেছে, এই নোটের পশ্চাতে স্বর্ণ বা রৌপ্য না থাকিলেও বিলাতী মুদ্রা স্টার্লিঙের পৃষ্ঠপোষকতা রহিয়াছে। এই ৭০০ কোটি টাকা মূল্যের স্টার্লিং কোথা হইতে আসিল, এখানে তাহার একটু ইতিবৃত্ত দেওয়া আবশ্যক। যুদ্ধের প্রয়োজনে ইংলণ্ড এ দেশে অসংখ্য পণ্য ও সৈন্য খরিদ করিয়া চলিয়াছে এবং তাহার মূল্য আমাদিগকে টাকায় না দিয়া স্টার্লিং দ্বারা পরিশোধ করিয়া আসিতেছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমাদের অভিভাবক হিসাবে আমাদের হইয়া যে টাকা নিজ দেশ হইতে পূর্বে ধার করিয়াছিল, তন্মধ্যে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস নাগাদ ২১৮ কোটি টাকা এই স্টার্লিং হইতে পরিশোধ করিয়া লইয়াছে। ১৯৪৩ মার্চ অন্তে বাকি বিলাতী দেনা পরিশোধিত হইয়া এবং B. N. W. & R. K. রেলওয়ে খরিদ বাবত ১৭ কোটি টাকার স্টার্লিং দিয়াও ভারতবর্ষের অনুকূলে ১৯৪৪ জানুয়ারী পর্যন্ত মোট ৭৪৩ কোটি• টাকার স্টার্লিং ব্যালান্স দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের আজ কত বড় গৌরবের দিন! ছিল এতকাল অধমর্ণ হইয়া, আজ উত্তমর্ণের পদলাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। এ সবই ঠিক। কিন্তু আবার ইহাও ঠিক, এত টাকার মালিক হইয়াও আমাদের দীন দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না। ইহাই অর্থশাস্ত্রের মার, টাকার সংখ্যাতত্ত্বের ভেলকিবাজি। অর্থ যে ঐশ্বর্য নহে, ইহা ভাল করিয়া বুঝিবার দিন আসিয়াছে। দেশে ঐশ্বয আছে, অর্থ নাই, এই সমস্যার মীমাংসা সম্ভব; কিন্তু ঐশ্বর্য নাই, অর্থ আছে, এই সমস্যা অমীমাংসনীয়। আর যদি প্রচুর অর্থের সহিত স্বল্প ঐশ্বর্যের সমাবেশ হয়, তাহা হইলে ইহারই নাম ইন্‌ফ্লেশন, যাহার ফলে হয় পণ্যমূল্য চড়কগাছ, ধনী ও সন্ধানীদের মহোল্লাস এবং দরিদ্রদের সর্বনাশ বর্তমানে তাহাই ঘটিয়াছে।

অনেকে মূল সমস্যাটিকে চাপা দিতে চান এই বলিয়া যে, যত কোটি টাকার নোটই চলুক না কেন, এই নোটগুলির পশ্চাতে যখন যথেষ্ট পরিমাণ স্টার্লিং সিকিউরিটি রহিয়াছে, তখন এই অবস্থাকে 'ইন্‌ফ্লেশন' বলা যায় না। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, নোটের পশ্চাতে যথেষ্ট পরিমাণ সিকিউরিটি আছে, কি নাই, এবং স্টার্লিংকে উপযুক্ত সিকিউরিটি মনে করা যাইতে পারে কি না, তাহা এক্ষেত্রে বিচার্য নহে (যদিও এ বিষয়েও আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে)। আমাদের বর্তমান বক্তব্য হইতেছে, যুদ্ধের এই ৪ বৎসরে বাজারে যে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকার নোট ছাড়া হইয়াছে তাহার পৃষ্ঠপোষকতায় যদি যথেষ্ট সিকিউরিটি থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলেও ইন্‌ফ্লেশনের বিচারে উহা বড় কথা নহে। বড় কথা হইল, বাজারে যে পরিমাণ ভোগ-সামগ্রী বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই অনুপাতে অতিরিক্ত নোট ছাড়া হইয়াছে কি না? অথবা গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের দরুণ যে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটি টাকা সর্বসাধারণের উপার্জন বা আয় হইতে গৃহীত হইয়াছে কি না? কিংবা যে পরিমাণে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, ঠিক সেই পরিমাণে দেশের লোকের ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে কি না? যদি এই প্রশ্নগুলির উত্তর সব 'হাঁ' হয়, তাহা হইলে আমরা স্বীকার করিব, 'ইন্‌ফ্লেশন' হয় নাই। কিন্তু এই প্রশ্নগুলির খাঁটি উত্তর চক্ষুষ্মান কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

এখন প্রশ্ন হইবে, গবর্ণমেণ্ট উচ্চতর হারে কর-নির্ধারণ ও অধিকতর পরিমাণে ঋণ-গ্রহণের পথ অবলম্বন না করিয়া নূতন অর্থ-সৃষ্টির পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইলেন কেন? তাহার উত্তর হইতেছে, যে দেশে শাসক ও শাসিতের মধ্যে মনের মিল ও পারস্পরিক আস্থা নাই, যে দেশে "স্বরাজ" "স্বরাজ" করিয়া একদল লোক মানুষকে বিপথগামী করিয়া তুলিতে চায়, ভোগের সামগ্রী স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যুদ্ধের প্রয়োজন

ছাড়িয়া দিবার আগ্রহ যেখানে আদৌ নাই, ধার চাহিলে সুদের লোভেও যেখানে ধার পাওয়া কঠিন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বাড়াইতে গেলে ধনী-নির্ধন সকলে সমস্বরে যেখানে প্রতিবাদ শুরু করে, সেখানে ইন্‌ফ্লেশন-রূপ স্বর্ণমৃগের সাহায্য ব্যতিরেকে মনুষ্য-হৃদয় জয় করিবার অন্য কি সহজ ও প্রশস্ত পথ থাকিতে পারে ?

সরকার বাহাদুরের এই উদ্দেশ্য আশাতীত সফল হইয়াছে। নন্-কো-অপারেশন করিয়া নিষেধের গণ্ডি টানিয়া, গোসা করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিব, সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু স্বর্ণমৃগ আমাদের সকলকেই ঘরের বাহির করিয়া ছাড়িয়াছে এবং বহু লোকের ভাগ্যে শিকাও ছিঁড়িয়াছে। ঠিকাদার, কন্‌ট্রাক্টার, ব্যবসাদার, দোকানদার, প্রডিউসার, ম্যানুফ্যাক্‌চারার, দালাল, উপদালাল অনেকেই যখন লাখের চতুর্দোলায় লক্ষ্মীকে ঘরে আনিলেন এবং যাঁহারা এতদূর যাইতে পারিলেন না, তাহারাও খাকি চড়াইয়া, শিখিধ্বজ সাজিয়া মাসান্তে কিঞ্চিৎ রজত-মূল্যের কাগজী দক্ষিণা পকেটে পুরিয়া নগর ও সহরের পথঘাট সরগরম করিয়া তুলিলেন, এবং সরকার বাহাদুরও বুঝিলেন স্বর্ণমৃগের নেশা ইহাদিগকে বেশ পাইয়া বসিয়াছে, আর ভয়ের কোন কারণ নাই, এবং আরও দেখিলেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধের অবস্থাও অনেকটা আশাপ্রদ, তখনই স্বর্ণমৃগ বধের আদেশ প্রচারিত হইল। এখন হইতে আর কেহ সরকার বাহাদুরের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত নূতন যৌথ-কোম্পানি বা কারবার খুলিতে পারিবে না, নূতন করিয়া শেয়ার বিক্রয় করিয়া পুরাতন কারবার বাড়াইতে পারিবে না, যে কোম্পানি বা কারবার চলিতেছে তাহার অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৯৩৪ অংশই সরকার বাহাদুরকে দিতে হইবে, ইত্যাদি। শীঘ্রই আরও কয়েক দফা অর্ডিনান্স জারি হইবে—আশা বা আশঙ্কা করা যাইতেছে, যাহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটাইয়া যুদ্ধের বাজারে টাকা 'লুঠিবার' পথ সম্ভবতঃ

আরও ভালরূপে রুদ্ধ করা হইবে এবং গবর্ণমেণ্ট ডিফেন্স লোনে টাকা ধার দেওয়া ভিন্ন তখন গত্যন্তর থাকিবে না, মজুরির হার আর বাড়িতে দেওয়া হইবে না, সকলকেই, এমন কি শ্রমিক ও মজুরদের পর্যন্ত ডিফেন্স-লোন ক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে বাধ্য করা হইবে, কৃষিজীবী ও ভূম্যধিকারীদের উপর নূতন করিয়া কর ধার্য হইবে এবং 'বাধ্যতামূলক' অর্থ-বিনিয়োগ সম্পর্কে নূতন ব্যবস্থা করা হইবে।

এই সমস্ত প্রকাশিত অর্ডিনান্স ও অপ্রকাশিত স্পেকুলেশনের উদ্দেশ্য খুবই সুস্পষ্ট। যে অপরিমিত অর্থ আজ ইন্‌ফ্লেশনের কল্যাণে ধনী ও প্রভাবশালীদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের ও সরকারের আওতায় যাহার ছিটেফোঁটা লাভ বহু ইতরজনের ভাগ্যেও ঘটিয়াছে, তাহাই, সকল মানুষের আয়ের উপর একটা ঊর্ধ্বসীমা-রেখা টানিয়া দিয়া, নূতন ইণ্ডাষ্ট্রি পত্তন ও পুরাতন ইণ্ডাষ্ট্রি প্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়া, তুলিয়া লওয়াই হইল সরকার বাহাদুরের নয়া পলিসি। রুই, কাতলা হইতে চুনোপুটি অনেকেই ইন্‌ফ্লেশনের টোপ গিলিয়া বেশ খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া লইয়াছে। ইহাদিগকে খেলাইবার জন্য সুতাও যথেষ্ট ছাড়া হইয়াছিল, এইবার সুতা গুটাইবার পালা। তাই সরকার বাহাদুর এখন তাহার শাসন-যন্ত্রের 'গিয়ার' 'রিভার্স' করিয়া দিতেছেন। এবার ইন্‌ফ্লেশন-পর্বের প্রস্থান এবং ট্যাকসেশন ও বরোয়িং (ভলাণ্টারী অ্যাণ্ড কম্‌পালসারী) পর্বের রঙ্গমঞ্চে নব কলেবরে প্রবেশের পালা, কিন্তু তাহার মধ্যেও গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিবার ভঙ্গিমা, বউমাকে শাসন করিয়া দাসীকে সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস।

স্টার্লিঙের প্রেমালিঙ্গন

বিভিন্ন দেশের মধ্যে যখন পণ্যের কেনাবেচা হয়, তখন তার মূল্য দেওয়া হয় বিক্রেতার দেশের মুদ্রার দ্বারা। ইহাই স্বাভাবিক এবং ইহাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের রীতি। ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা মিটাইবার সময়ও সেই নিয়মই প্রচলিত; কারণ যে বিক্রেতা সেইই পাওনাদার, নির্দেশ দিবার অধিকার তাহারই। সুতরাং যে মুদ্রার সহিত তাহার পরিচয় নাই, এবং যে মুদ্রা তাহার দেশে অচল, সেই মুদ্রায় সে তাহার প্রাপ্য টাকা গ্রহণ করিতে কখনও রাজী হইতে পারে না। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা প্রচলিত, এবং সকল মুদ্রাই নিজ নিজ দেশের এলাকার মধ্যেই শুধু সচল। সেইজন্যই বিলাত-যাত্রা করিবার পূর্বে শুধু পোশাক বদলাইলেই চলে না, টাকার বদলে স্টার্লিং খরিদ করিয়া ট্রাউজারের পকেট ভরিয়া লইতে হয়। এমন কি রাজবংশীয় শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের পর্যন্ত ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্বে শ্বেতদ্বীপের আর কিছু পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন না হইলেও দেশীয় মুদ্রাকে বর্জন করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া আসিতে হয়। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায়, আমাদের ভাগ্যে, বহু ক্ষেত্রে যেমন প্রচলিত স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তেমনই বিষম ব্যতিক্রম ঘটিয়া আছে। ইহাতে বিস্ময় বা ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া লাভ নাই। কারণ যে জাতি মানবের জন্ম-স্বত্ব—নিজ স্বাধীনতার দাবি আজও জগৎসভায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই, স্বায়ত্ত-শাসনের উপযোগী নহে বলিয়া যে দেশের মাটি আজও দেশবিদেশে প্রচারিত,

তাহার ভাগ্যে অপর বহু ব্যবস্থা ও বিশ্বজনীন নিয়ম-কানুন যে অনুপযোগী বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? তাই যুদ্ধের সূচনা হইতে যে অজস্র পণ্যসম্ভার ভারতবর্ষ হইতে ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার মূল্য বিধিমত আমাদের দেশের মুদ্রায় দিবার দায়িত্ব ইংলণ্ড নিজে গ্রহণ না করিয়া উদারভাবে তস্য অনুগত ভৃত্য ভারত গবর্ণমেণ্টের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। তাহার অর্থ এই যে, পণ্যমূল্য দিবার জন্য ভারতবর্ষের মুদ্রা 'টাকা' সংগ্রহ করিবার বিষম দায় আর ইংলণ্ডের রহিল না—সেই দায় যে দেশ পণ্য-সম্পদ বিক্রয় করিবে, সেই দেশের গবর্ণমেণ্টকেই ঘাড়ে করিতে হইবে! নিয়ম-বহির্ভূত এই মামার বাড়ির আবদার উপেক্ষা করা বিমাতার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই; তাই আজ এই ভীষণ কুম্ভীপাকের সৃষ্টি হইয়াছে, টাকার ছড়াছড়ি ও প্রাচুর্যের মধ্যে ভয়ঙ্করী বুভুক্ষার করাল-মূর্তি দেখা দিয়াছে।

এখানে কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন, বিদেশে পণ্য খরিদ করিলে তাহার মূল্য দিবার জন্য সেই দেশের মুদ্রা সংগ্রহ করা যাইবে কোন্ উপায়ে?* এই প্রশ্নের উত্তর হইতেছে—(১) ঐ দেশে নিজ দেশের পণ্য বিক্রয় করিয়া, (২) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনা-পাওনা মিটাইবার সর্বজনীন ধাতু স্বর্ণ প্রেরণ করিয়া, (৩) বিদেশের শিল্প-বাণিজ্যে, ব্যাঙ্ক-ইনসিওরেন্সে নিয়োজিত মূলধন কিংবা সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া, (৪) বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া। এখন প্রশ্ন হইবে, ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে তাহার পণ্যমূল্য দিবার জন্য ভারতীয় মুদ্রা 'টাকা' উল্লিখিত কোন্ উপায়ে সংগ্রহ করিতেছে? ইহার উত্তর প্রবন্ধের সূচনাতেই দিয়াছি। প্রচলিত কোন পন্থাই অবলম্বন না করিয়া ইংলণ্ড ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত যোগাযোগে যে অভিনব প্রণালীতে কাজ চালাইয়া যাইতেছে, তাহার একটি চিত্র আমরা এভাবে অঙ্কিত

করিলে সম্ভবতঃ অন্যায় হইবে না।—যত পার মাল খরিদ করিয়া যাও, কোন দিকে দৃকপাত করিও না, মূল্যের কথা ভাবিও না। যত টাকাই লাগুক, তাহার জন্য আমি এখানে স্টার্লিং গুণিয়া তোমার নামে আলাদা করিয়া রাখিয়া দিতেছি। তুমি বলিতেছ, তোমাদের চলিবে কি করিয়া? দাম যে বাকি পড়িয়া রহিল? তোমার দেশের লোক মাল বেচিয়া মূল্যের জন্য 'টাকা' 'টাকা' করিয়া তোমায় অস্থির করিয়া তুলিবে? তাহার জন্য এতটা উতলা হইয়াছ কেন? কাগজ তো আছে, 'টাকা'র নোট ছাপিয়া যাও। কি বলিলে? নোটের সিকিউরিটির কি হইবে? কেন, তাহার জন্য আবার ভাবনা কিসের? আমার হাতে তোমাদের জন্য স্টার্লিঙের সাতনরী হারই রহিল।

সে কথা খুবই ঠিক। প্রভু, আপনি যতই মাল টানিতেছেন (কারণ-বারি পান করিতেছেন অর্থে নহে), ততই স্টার্লিঙের কণ্ঠহার আমাদের জন্য দীর্ঘ ও ভারী হইতেছে সত্য; কিন্তু বিপদ হইযাছে, আমাদের দেহও যে এদিকে ততই বিশুষ্ক হইয়া উঠিতেছে, প্রাণপাখীর ধুকধুকি ক্রমে ততই নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। আপনি বিধাতার পরম করুণায় শত্রুমুখে ছাই দিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করুন এবং স্টার্লিঙের এই কণ্ঠহার আমাদের উপহার দিবার সুযোগ লাভ করুন। কিন্তু ভয় হয়, আমরা ক্রেডিট বিজ্‌নেস (ধারে কারবার) করিয়া সেই শুভদিন পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিব তো প্রভু? মাস্টার্স ভয়েসের প্রতিধ্বনি করিয়া, গাল-ভরা স্টার্লিং সিকিউরিটির দোহাই দিয়া, দেশবাসী যাহারা এই ভাগ্যহীন দেশের পরম দুর্গতির মূল কারণটিকে চাপা দিয়া মনের আনন্দে নোট কুড়াইতে ব্যস্ত আছেন, তাঁহাদের প্রতিও আমাদের ওই একটি কায়মনোবাক্যে নন্‌-ভাঁওলেণ্ট করুণ প্রশ্নই করিবার আছে।

স্টার্লিং-রহস্য সম্পর্কে আর অধিক আলোচনা করিবার পূর্বে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট আমাদের নিকট যুদ্ধের আরম্ভ হইতে এ পর্যন্ত কোন্ জিনিস

কি পরিমাণ 'ক্রয়' করিয়াছেন, তাহার হদিস পাইবার চেষ্টা করা যাক্, যদিও কাজটি মোটেই সহজসাধ্য নহে। কারণ এবম্বিধ তথ্য জানা ও জানানো নিষেধ, যেহেতু ইহা ওয়ার সিক্রেট। অবশ্য দেশের পক্ষে ইষ্টানিষ্টের এত বড় কথা সিক্রেটের ধমক দিয়া চাপা দেওয়া এই দেশেই চলে, স্বদেশে কিন্তু উহা একেবারেই অচল। সেখানে যত বড মিলিটারী সিক্রেট হউক না কেন, সাধারণেব প্রতিনিধি, পার্লামেণ্টের সদস্যগণ যদি দাবি করেন, তাহা হইলে বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্যের কুলচূডামণি ইংরেজ-কেশরী চার্চিল সাহেবকেও ভিজা বিডালটির মত সকল গূঢ় রহস্যই ফাঁক করিয়া দিতে হইবে, বড জোর তিনি তাহার জন্য পার্লামেণ্টের সিক্রেট সেশন দাবি করিতে পারেন। সে কথা না হয় থাক, এখন যে কথা বলিতেছিলাম। আমাদের দেশে বৃটিশ সরকারের খরিদের বহর সোজা পথে জানা না গেলেও পরোক্ষভাবে তাহার একটা কাছাকাছি আন্দাজী হিসাব করা একেবারে অসম্ভব নহে। এই দুই দেশে শুধু 'প্রাইভেট' ব্যবসায়িগণেব আমদানি ও রপ্তানির হিসাব যাহা পাওয়া যায়, তদৃষ্টে দেখা যায় যে, ভারতেব বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ যুদ্ধের এই কয় বৎসরে আমদানি অপেক্ষা প্রায় ৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর বৃটিশ গবর্মেণ্ট কি পরিমাণ পণ্য এই দেশ হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনে খরিদ কবিয়াছেন, তাহার একটা গৌণ হিসাব আমরা পাইতে পারি, যদি এই পণ্যমূল্য বাবদ আমাদের কি পরিমাণ বিলাতী স্টার্লিং-দেনা পরিশোধ ও নগদ স্টার্লিং-সিকিউরিটি জমা হইয়াছে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করি। যুদ্ধের পূর্বে বিলাতে ভারত গবর্মেণ্টের স্টার্লিং-লোনের পরিমাণ ছিল ৪৬৯ কোটি টাকা। এই দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়া বৃটিশ গবর্মেণ্টের নিকট গত জানুয়ারী পর্যন্ত আমাদের দেশের ৭৪৩ কোটি টাকার স্টার্লিং প্রাপ্য দাঁড়াইয়াছে। তাহা হইলে ১২১২ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ও শ্রম আমরা বৃটিশ সরকারের নিকট ৪ বৎসরে বিক্রয়

করিয়াছি। ইহা বড সহজ ব্যাপার নহে। হিসাবটি আরও একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে পাঁচ বৎসরের মোট ভারতীয় রপ্তানি-পণ্যের গড়পড়তা বার্ষিক মূল্য আমরা দেখিতে পাই ১৮১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শুধু যুক্ত-রাজ্যে প্রেরিত মালের মূল্য ৪৬½ কোটি টাকা। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সারা দুনিয়ার হাটে ছয় বৎসরে আমরা যে পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিয়া থাকি, ৭ বৎসরে শুধু ইংলণ্ডের নিকটই আমরা সেই মূল্যের পণ্য বিক্রয় করিয়াছি।(১) পক্ষান্তরে যে মূল্যের পণ্য ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় করিতে আমাদের ২২।২৩ বৎসর লাগিত, তাহাই যুদ্ধের ৪ বৎসরে তাহার নিকট আমরা বিক্রয় করিয়াছি।(২) ইহা কি ব্যবসা, না বদান্যতা —প্রেম, না প্রতারণা?

সরল বুদ্ধিতে অনেকেই হয়তো ভাবিতেছেন, এ আবার কি কথা! এই বৈশ্য যুগে, বৈশ্য সভ্যতায় কে কাহাকে ছাড়াইয়া পণ্য বিক্রয় করিবে তাহা লইয়াই যখন এত রেষারেষি, এত মারামারি, খুনাখুনি, তখন এত পণ্য বিক্রয় করিতে পারা তো পরম ভাগ্যের কথা। দৈবক্রমে আমাদের ভাগ্যচক্র যদি ঘুরিয়াই থাকে, তাহা হইলে তাহার পূর্ণ সুযোগ আমরা গ্রহণ করিব না কেন? আপাতদৃষ্টিতে ঐরূপই মনে হয় বটে। কিন্তু যে দোকানদার তাহার দোকানের চাল-ডালের সমগ্র স্টক নিঃশেষে বিক্রয় করিয়া ঘরে 'চাল-বাড়ন্ত' বলিয়া টাকার থলি বা নোটের তাড়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া সপরিবারে উপবাস করে, তাহাকে কি আপনারা বুদ্ধিমান বলেন? 'টাকা' 'টাকা' করিতে করিতে

(১) ১৮১ কোটি × ৬ = ১০৮৬ কোটি টাকা (প্রাইভেট ব্যবসায়িগণের খরিদ বাদে)
(২) ৪৬½ কোটি × ২৩ = ১০২৩ কোটি টাকা

আমরা টাকাটাই শুধু চিনিয়াছি। কিন্তু বস্তুবিহীন টাকা যে গড়ের মাঠের মত ফাঁকা, সে কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, ফরমাশ দিয়া ছাপাখানার সাহায্যে যথেচ্ছা অর্থ সৃষ্টি করিতে পারা গেলেও, ফরমাশ দিয়া ইচ্ছামত মানুষ ও পণ্য সৃষ্টি করা যায় না। যে শিশু ভ্রূণরূপে মাতৃ-জঠরে, যে শস্য বীজরূপে ভূগর্ভে, যে বৃক্ষ আজও মুকুলিত হয় নাই, মানুষের দুর্লোভে, অর্থের প্রলোভনে, চব্বিশ ঘণ্টা, এমন কি চব্বিশ দিনের দাবিতে, মিলিটারী আদেশেও তাহাদিগকে ভবিষ্যতের গর্ভ হইতে পরিপূর্ণ সৃষ্টিরূপে মানুষের রক্ত-কলুষিত হস্তে তুলিয়া দেওয়া যায় না। এবং তাহা যায় না বলিয়াই আমাদের অনেকের পরিধানের শেষ বস্ত্রখণ্ড ও মুখের শেষ গ্রাসটুকুর উপর এমন কড়া টান পড়িয়াছে। অন্য দেশ হইতে পণ্য আমদানি করিয়া সেই দুরবস্থা যে কিঞ্চিৎ দূর করিব সে গুড়েও বালি; কারণ শিপিং স্পেসের অভাবের দোহাইয়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও পণ্যমূল্য দিবার বেলায় সকলেই নিজের কড়িতে আপন কড়াগণ্ডা বুঝিয়া লইতে চাহিবে, আমার কড়ির অঙ্ক লিখিয়া খাতায় সহি দিয়া মাল পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস—৬০০০ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করিয়াও যিনি ভারতের ৪০ কোটি প্রাণীর জীবন-মরণ ও মঙ্গলামঙ্গলের সর্বময় প্রভু, সেই আমেরী সাহেব অম্লানবদনে জগৎসমক্ষে ঘোষণা করিলেন, আমাদের বর্তমান দুর্গতির জন্য আমাদের অধিকতর ভোজন (increased consumption of food) এবং সঞ্চয়প্রবৃত্তিই (hoarding) দায়ী! কবি কি আর কম দুঃখে লিখিয়াছিলেন, "কি যাতনা বিষে—" ইত্যাদি। সে কথা যাক। কিন্তু আমরা উপরে আমাদের শেষ মুখের গ্রাস ও বস্ত্রখণ্ড সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, তাহা যে বিকারগ্রস্ত রোগীর নিছক কল্পনা নহে (যদিও বুদ্ধিভ্রংশ ও বিকারের আর

বড় বেশি বাকিও নাই), নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান হইতেও তাহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যাইবে—

খ্রীষ্টাব্দ	আমদানির অতিরিক্ত রপ্তানি	তন্মধ্যে খাদ্যসামগ্রী	সুতা ও কাপড়
১৯৩৯-৪০	৪৮,২৯ লক্ষ টাকা	৬,৭৯ লক্ষ টাকা	৫,০৭ লক্ষ টাকা
১৯৪০-৪১	৪১,৮৮ " "	১৯,৪০ " "	৬,১৭ " "
১৯৪১-৪২	৭৯,৬০ " "	৩৪,৮০ " "	৩১,২০ " "

এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে, আমরা ১৯৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে যে পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী এবং সুতা ও বস্ত্র রপ্তানি করিয়াছি তদপেক্ষা ছয় গুণ (কাছাকাছি হিসাব ধরা হইল) অধিক রপ্তানি করিয়াছি ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই ; তবে নিজেদের অবস্থা হইতে কতকটা অনুমান করিতে পারি মাত্র। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ১৯৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের যে ৮০ কোটি টাকার রপ্তানি-আধিক্য দেখা যায়, তন্মধ্যে ৬৬ কোটি টাকাই খাদ্যসামগ্রী ও বস্ত্রাদির দরুণ। এখানে আরও একটি কথা বিশেষ-ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উপরে আমরা যে হিসাব দিলাম তাহা শুধু 'প্রাইভেট' ব্যবসায়ীদের আমদানি-রপ্তানির হিসাব—ব্রিটিশ-গবর্ণমেণ্টের বিরাট খরিদের হিসাব ইহাতে নাই। কেন নাই, তাহার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তবে এই হিসাবেরও একটা বড় অংশই যে খাদ্যদ্রব্য এবং সূত্র ও বস্ত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার সম্ভবতঃ অবকাশ নাই। ইহার পর এ দেশে আহার্য বস্তু ও পরিধেয় বস্ত্র যে এরূপ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হইবে, তাহাতে আর বিস্মিত হইবার কি আছে ?

কিন্তু দুষ্প্রাপ্য বা দুর্মূল্য কিছুই হইতে পারিত না, যদি ইংলণ্ডকে নগদ মূল্যে 'টাকা' দিয়া আমাদের পণ্য ক্রয় করিতে হইত। এখানে

কেহ হয়তো প্রশ্ন করিতে পারেন, ভারতীয় পণ্যোৎপাদক ও ব্যবসায়িগণ মূল্য বাবদ যখন নগদ টাকা পাইতেছে, হইতে পারে তাহা কাগজী নোট, তখন নগদ মূল্যে টাকা দিয়া পণ্য ক্রয় করা হইতেছে না—এ কথা ভাবিবাব বা বলিবার ন্যায়সঙ্গত কি কারণ থাকিতে পারে? এই প্রশ্নেব জবাব দিতে হইলে আর্থিক যন্ত্রের ভিতরকার কলকব্জাটা একটু তলাইয়া দেখা ও বোঝা দবকাব। পণ্য খরিদ করিতেছেন ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট, কিন্তু তাহাব জন্য নগদ মূল্য দিতেছেন ভারত গবর্মেণ্ট—টাকার নোট ছাপাইয়া, বিনিময়ে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট, ভারতের অনুকূলে স্টালিঙেব একটি হিসাব লিখিযা নিজের নিকট রাখিয়া দিতেছেন। এইরূপ স্টার্লিং সিকিউবিটিকে I. O U. ঋণপত্র ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে, এবং ইহাকে ধারে কারবার না বলিলে আর কাহাকে ধারে কারবার বলিব? ইহার ফল আমাদের পক্ষে কেন এতটা মারাত্মক হইতেছে, তাহা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। প্রথমত, স্টার্লিং-মুদ্রার আই. ও ইউ লিখিয়া দিলেই যদি যত খুশি পণ্যসম্ভাব কোন দেশ হইতে ক্রয় করা সম্ভবপর হয, তাহা হইলে এইরূপ স্বর্ণসুযোগ এই প্রকার দুঃসময়ে কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং এক দিকে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট দিলদরিয়া মেজাজে ভারতে পণ্য ও সৈন্য ক্রয় করিয়া I. O. U ছাড়িতেছেন, অন্য দিকে ভারত গবর্মেণ্ট তাহার মূল্য যোগাইবার জন্য সমান তালে নোট ছাপিয়া চলিয়াছেন, এবং ফলে গরিবের পক্ষে পণ্য ততই দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্য ততোধিক দুরধিগম্য হইয়া উঠিতেছে। এবারকার লড়াইয়ে ইনফ্লেশনের এরূপ নিরাভরণ নির্লজ্জ নগ্ন মূর্তি পৃথিবীর আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। দেশ-বিদেশে কাগজী নোটের সিকিউরিটি হইল স্বর্ণ। আর এ দেশে স্বর্ণবিচ্যুত, অন্তবিহীন স্টার্লিং এবং (ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে, ভারত গবর্মেণ্টের অর্ডিনান্সের বলে

প্রচারিত) I. O. U. ঋণপত্র (Treasury Bills) হইল তাহার জামিন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি কায়া আর কোন্‌টি যে তাহার ছায়া, কোন্‌টি সারবস্তু আর কোন্‌টি অসার কাগজ মাত্র, আমরা তো তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, নৈয়ায়িকেরা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

ইহার পরেও কেহ হয়তো সন্দিগ্ধ চিত্তে বলিবেন, ইংলণ্ডের মত মহাজনের দেওয়া ঋণপত্র সোনার পাত অপেক্ষা কম হইল কিসে?

বিলাতের বুলি,

বুলিয়ন বলি(১)

রেখো রেখো হৃদে ধ্রুবজ্ঞান।

খুব সত্য কথা। সেই ধ্রুবজ্ঞান লইয়াই আজও আমরা বৃহৎ একটা দল কোন রকমে বাঁচিয়া আছি। কিন্তু আমাদের আপত্তি তো সেখানে নয়; আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা হইতেছে এই যে, আপনার I. O. U. Payable when able—ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—আমাদের মাথার মণি। আপনি শুধু শুধু তবে কেন এতটা লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ করিয়া ভারত গবর্মেণ্টের খোশামুদি করিয়া তাহার দ্বারা আবার কাগজী নোট ছাপাইয়া আমাদিগকে নগদ বিদায় দিবার জন্য এতটা উতলা হইয়াছেন? এই প্রকার ডবল দলিলের কি দরকার ছিল? আপনার খাতিরে ও আশীর্বাদে ধারে বিক্রয়ের ধাক্কা হয়তো কোন প্রকারে সহিতে পারিতাম; কিন্তু প্রভু, এইরূপ নয়া কায়দায় নগদ বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়া দেশে যে ইন্‌ফ্লেশনের বন্যা আনিয়াছ, তাহাতে আমরা গরিবরা যে একেবারে ডুবিতে বসিয়াছি। আমাদেরই বুকের পাঁজর দিয়া আমার দেশের ও তোমার দপ্তরখানার বহু লোক যে পাঁচতলা সৌধের ভারা বাঁধিতেছে, তাহা কি তুমি

(১) পাঠান্তরে—বিলাতের খুলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখো রেখো হৃদে ধ্রুবজ্ঞান।

দেখিতে পাইতেছ না? এই জ্বালা আর সহিতে না পারিয়া বড় দুঃখে এক এক সময় বলিতে ইচ্ছা হয়, প্রভু, যাহা লইয়াছ, তাহা তোমাকে দিলাম, তোমার নিকট তাহার মূল্য চাহি না, কিন্তু দোহাই তোমার, তোমার বাকি কারবারের লজ্জা ঢাকিবার জন্য এভাবে নগদ বিদায়ের ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে আর কষ্ট দিও না। ক্ষোভে বা অভিমানে এ কথা বলিতেছি না। আমরা বিশ্বাস করি, নগদ মূল্যে পণ্য খরিদের আত্মপ্রবঞ্চনা যদি তোমাদিগকে এতটা অন্ধ করিয়া না রাখিত, সত্যই যদি খোলাখুলিভাবে দানস্বরূপ পণ্যগুলি তুমি গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে এতটা পণ্য লইতে সম্ভবতঃ তোমার বিবেকে বাধিত এবং ভুয়া অর্থ সৃষ্টি করিয়া গরিব-ধ্বংসের পালা এভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না।

স্টার্লিং-সিকিউরিটির বা আই. ও ইউ প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য ও মূল্য কতখানি তাহা এখন অন্যভাবে বিচার করিয়া দেখা যাক। মানুষের স্মৃতির পরিসর স্বল্প। তাই এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, ইংলণ্ড গত মহাযুদ্ধে আমেরিকা হইতে বহু টাকা ধার করিয়াছিল এবং এবারকার মত জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে তাঁহারই সহযোগিতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়া অবশেষে জয়লাভ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমেরিকার ধার শোধ করিতে ইংলণ্ডও পরবর্তীকালে অস্বীকার করে এবং আমেরিকা তাহার প্রাপ্য টাকা শেষ পর্যন্ত আদায় করিতে অসমর্থ হইয়া Johnson Act ও Neutrality Act নামে দুইটি আইন পাস করিয়া গত যুদ্ধের দেনচোর (War Debt defaulters) এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধের ভাগীদার দেশগুলিকে টাকা ধার দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। আমেরিকার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বড় আর্থিক দুর্যোগের সময়, অর্থের প্রয়োজন যখন তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল, তখন ইংলণ্ডের মত অধমর্ণও হাত গুটাইয়া বসিয়াছিল।" সেই তিক্ত

অভিজ্ঞতারই ফল এই দুইটি নিরেট নিষ্করুণ আইন। তাই রুজভেল্টের পিলে হিট্‌লারের হুঙ্কারে প্রথম হইতেই চমকাইয়া উঠিলেও এবং চার্চিলের নিরাপদ বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবার প্রবল আগ্রহ তাঁহার পূর্বাপর প্রকাশ পাইয়া থাকিলেও, নন্‌-বেলিজারেণ্ট বন্ধু অথবা বেলিজারেণ্ট দোসর, কোন হিসাবেই তিনি টাকা ধার দিতে কিংবা ধারে পণ্য বিক্রয় করিতে রাজী হন নাই। সেখানে ভদ্রলোকের এক কথা—ফেল কড়ি, মাখ তেল। সে কড়ি আবার স্টার্লিঙের নয়, কারণ সেখানে স্টার্লিং অচল, স্টার্লিঙের আই. ও ইউ. আরও অচল। সচল শুধু ভোগৈশ্বর্য, স্বর্ণ ও ডলার, যেমন সর্বত্র রীতি। সুতরাং কড়ি সংগ্রহ করাও কঠিন ব্যাপার। তাই আমেরিকার নাম হইয়াছে 'কঠিন ঠাঁই' (hard country) এবং তাহার মুদ্রার নাম হইয়াছে 'কঠিন মুদ্রা', (hard currency)! "The hard currencies are, broadly speaking, those we want most and find it hardest to acquire. The chief of the hard currencies is, of course, the U.S. dollars. It is essential to cut down imports that come from hard countries."—*Ways & Means of War* by G. Crowther. এই বইয়েরই অন্যত্র—"If we buy too much from a 'soft' country, it must either take payment in goods or not at all." আমার বিচারে "not at all" অপেক্ষাও আমাদের পক্ষে বর্তমান ব্যবস্থা খারাপ, কেন তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

এখানে আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপারের উল্লেখ করিতেছি। জীবন-মরণ সংগ্রামে যে আমেরিকা বড় দোসর হইয়া নামিয়াছে, তাহারই পণ্যমূল্য ডলারে সদ্য সদ্য নগদ না দিলে ইংলণ্ডের মান-ইজ্জত থাকে না। সুতরাং ইংলণ্ডকে ডলার সংগ্রহ ব্যাপারে সাহায্য

দান করিবার ব্যাপারেও আমাদের ভারত গবর্মেণ্ট পরম উদারভাবে লাগিয়া গিয়াছেন! কি ভাবে, বলিতেছি। যুদ্ধের প্রয়োজনে আমেরিকা এ দেশ হইতে যে দ্রব্যাদি (১) ক্রয় করিতেছে, তাহার মূল্য সেও আমাদিগকে টাকায় দিতেছে না, দিতেছে ডলারে। এবং সেই ডলার পরম সমাদরে ইংলণ্ড গ্রহণ করিতেছেন, এবং বিনিময়ে পূর্ববৎ ভারত গবর্মেণ্টের নামে নিজখাতায় স্টার্লিং অঙ্ক জমা করিতেছেন! আর আমাদের গবর্মেণ্ট ইংলণ্ড ও আমেরিকার তরফ হইতে আমাদিগকে নোট ছাপিয়া নগদ বিদায় দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন! যাঁহারা এক সঙ্গে বিজয়গৌরব উপভোগ করিবেন, তাঁহারা কিন্তু নিজেদের কড়াগণ্ডা খুব সাবধানে বুঝিয়া লইতেছেন, পরস্পরকে বিধি-বহির্ভূত একটুকু সুবিধা দিতেছেন না; আর বিজয়ের সেই চরম শুভ-মুহূর্তেও চির-পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা মুছিবার প্রতিশ্রুতিটুকু পর্যন্ত যাহার ভাগ্যে আজও লাভ হইল না, সে কিন্তু সব সহিয়া সব দিয়া চলিয়াছে। আমাদের উদারতার কথা যখন চিন্তা করি, আত্মপ্রসাদে মন ভরিয়া উঠে; কবি দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিতে ইচ্ছা করে—

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

---

(১) তন্মধ্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণ স্বর্ণও রহিয়াছে।

পরাধীন জাতির রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

স্যার আশুতোষ চৌধুরী নিখিল বঙ্গ রাজনীতিক কন্‌ফারেন্সের কোন এক অধিবেশনে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন : "A subject nation has no politics."—পরাধীন জাতির কোন রাজনীতি থাকিতে পারে না। পরবর্তীকালে বহু লোকের মুখে সারগর্ভ মন্তব্য হিসাবে এই উক্তিটি শুনিয়াছি ; কিন্তু ইহার ঠিক তাৎপর্য কখনো ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উঠিতে পারি নাই। আমার বুদ্ধিতে ইহাই মনে হইয়াছে, যে জাতি স্বাধীন নহে, রাজনীতির গূঢ় রহস্য বা আদর্শ লইয়া তর্ক বা আলোচনা তাহার পক্ষে নিতান্তই নিরর্থক—যেহেতু, জাতীয় জীবনে বা রাজনীতিক্ষেত্রে কোন বিশেষ আদর্শ ও পন্থা অনুসরণ করিবার তাহার কোন অধিকারই নাই। সুতরাং কোন রকম তন্ত্র, বাদ, 'ইজম্' বা স্কিম লইয়া মাতিয়া উঠিবার পূর্বে স্বাধীনতার ভাবনাটা তাহার সর্বাগ্রে সারিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহাই যদি তাঁহার বাক্যের প্রকৃত অর্থ হয়, তাহা হইলে অর্থনীতির ছাত্র হিসাবে আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হইতেছে,—"A subject nation can have no economics either." কেন, তাহারই একটু নমুনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দিবার চেষ্টা করিব।

বর্তমান সভ্যতার সহিত সমান তালে দৌড়ের পাল্লা দিবার জন্য স্বর্ণ আজ হিসাবের খাতায় নিজের পরিচয় লিখিয়া রাখিয়া চেক ও নোটরূপ পাখা ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিলেও এই কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, ব্রহ্ম সাকারই হউন, আর নিরাকারই

হউন, তিনিই যেমন জগৎপতি, তেমনি স্বর্ণ প্রকাশিত থাকুন কিংবা অপ্রকাশিত থাকুন, আর্থিক জগতের আজও তিনিই অধিপতি। কোন গবর্ণমেণ্ট যাহাতে লোভের বশবর্তী হইয়া নোট ছাপাইয়া ইনফ্লেশন-রূপী মায়া মরীচিকার সৃষ্টি করিয়া সমাজকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতে না পারে, তাহারই তিনি সতর্ক প্রহরী। তিনি আছেন বলিয়াই নোট ছাপিবার অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট হইয়া আছে এবং এই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নোটের কৌলীন্য লোকে স্বীকার করিতেছে। এই কারণেই প্রত্যেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেশের চলতি অর্থের মোট পরিমাণ এবং পণ্যমূল্য সুনিয়ন্ত্রিত রাখিবার উদ্দেশ্যে নোটের জন্য আইনানুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ তহবিল রাখিতে হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার ১৯৪৩, জুন পর্যন্ত যে বৎসর শেষ হইয়াছে, এখানে তাহার একটি হিসাব দিতেছি। ইহা আমাদের মত অন্ধ ব্যক্তির উপর অনেকটা নূতন আলোক-সম্পাত করিবে।

ব্যাঙ্কের দেনা :

ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোট	১৩,৬৮,৩৮,৯৩৪ টাকা
বাজারে চলতি নোট	৭৩২,৪৭,৯৭,৯৬৭॥০
মোট বিলিকৃত নোট	৭৪৬,১৬,৩৬,৯০১॥০

ব্যাঙ্কের সংস্থান :

স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণ	৪৪,৪১,৪৩,৩২৩।১১
স্টার্লিং সিকিউরিটি	৫৬৭,৭৮,৮৭,১৫৪৶৬
টাকার মুদ্রা (Rupee coin)	১৫,৫৪,৯০,৯৭০॥৴৭
ভারত সরকারের রুপি সিকিউরিটি	১১৮,৪১,১৫,৪৫৩।৵০
মোট সংস্থান	৭৪৬,১৬,৩৬,৯০১॥০

উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইবে নোটের দরুণ ৭৪৬ কোটি টাকার অধিক দায়ের জন্য মাত্র ৪৪·৪১ কোটি টাকার স্বর্ণমুদ্রা ও

স্বর্ণ রাখা হইয়াছে। ইহা নোট বাবদ মোট দেনার শতকরা ৬ ভাগ মাত্র! ইহাকে সিকিউরিটির নামে মুখ রক্ষা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। প্রভুদের অভিধানেই স্বর্ণই যখন সর্বদেশ ও সর্বজনগ্রাহ্য এবং সকল অর্থের শেষ আশ্রয় (sheet-anchor) তখন এই বিরাট পর্বতপ্রমাণ নোটের অন্ততঃ ২৫ ভাগ স্বর্ণ (কিংবা রৌপ্য) এই যুদ্ধের দুর্যোগেও রাখা উচিত ছিল বলিয়া আমরা মনে করি।

ইহাও তত বড় কথা নহে; বড় কথা হইল বর্ণচোরা স্টার্লিঙের মারাত্মক দৌরাত্ম্য। এক দেশের কাগজী অর্থের জন্য অন্য দেশের কাগজী অর্থ (স্বর্ণমুদ্রা নহে) কখনো সিকিউরিটি বা জামিন হইতে পারে, এইরূপ অদ্ভুত অস্বাভাবিক ব্যবস্থা দুনিয়ার কোন দেশে আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি এবং কল্পনাও করিতে পারি না। কিন্তু যাহা নাই জগতে তাহা আছে ভারতে। তাই উল্লিখিত হিসাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নোটের সিকিউ-রিটিরূপে বিলাতী স্টার্লিং দিব্য একটি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে এবং সেই স্থানটি সামান্য নহে—বিরাট। ৭৪৬ কোটি টাকার নোটের দরুণ স্বর্ণ সিকিউরিটি যেখানে মাত্র ৪৪·৪১ কোটি টাকা অর্থাৎ নোটের শতকরা ৬ ভাগ, সেখানে (কাগজী) স্টার্লিং সিকিউরিটি ৫৬৮ কোটি টাকা অর্থাৎ নোটের শতকরা ৭৬ ভাগ! আর একদিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে—১৯৩৯-৪০ হইতে ১৯৪২-৪৩ পর্যন্ত চারি বৎসরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের স্বর্ণ তহবিলের অঙ্ক স্থির হইয়া এক স্থানেই দাঁড়াইয়া আছে—৪৪·৪১ কোটি টাকা হইতে তাহার কোনরূপ নড়চড় হয় নাই। কিন্তু নোটের পরিমাণ ২৩৮·৫৫ কোটি টাকা হইতে বাড়িয়া ৭৪৬ কোটিতে পৌছিয়াছে, আর স্টার্লিঙের মোট পরিমাণ আসিয়া পৌছিয়াছে ৭৯ কোটি টাকা হইতে ৫৬৭·৭৮ কোটিতে! এই যুদ্ধের বাজারে পণ্য বেচিয়া স্বর্ণের পাহাড়

গড়িবার কথা আমাদের; কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, সব 'বিক্রয়' করিয়া আজ আমরা হইয়াছি—অন্নবস্ত্রের কাঙাল, আর বিনিময়ে পাইয়াছি—ভবিষ্যতের জন্য স্টার্লিঙের প্রতিশ্রুতি, আর বর্তমানের জন্য কাগজী ঝাঁটার মার। কি করিয়া এই সর্বনাশা ব্যাপারটা ঘটিতে পারিল তাহারই একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতেছি।

যুদ্ধ সুরু হইবার পাঁচ বৎসর পূর্বে যখন আমরা আমাদের বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক লাভ করিয়া আর্থিক ব্যাপারে বিশৃঙ্খলার অমানিশা ঘুচিল মনে করিয়া মহোল্লাস অনুভব করিয়াছিলাম, তখন আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদ্ পণ্ডিতদের কেহই সম্ভবতঃ কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, সামান্য একটি রন্ধ্রপথে শনিঠাকুর প্রবেশ করিয়া কি অনর্থ ঘটাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য আমাদের প্রভুদের দূরদৃষ্টি! রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্টে পূর্ব হইতেই এ দেশের কাগজী নোটের মাতব্বরি করিবার জন্য তাহাদের (কাগজী) অর্থকে অধিকার দান করিবার সর্ত করিয়াই শুধু তাঁহারা ক্ষান্ত থাকেন নাই, অধিকন্তু যাহাতে এই স্টার্লিং সিকিউরিটির কোনরূপ সীমা পর্যন্ত নির্দিষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থাও করিয়া রাখিয়াছিলেন! সেই জন্যই ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার পক্ষে পণ্য 'ক্রয়' করা এই দুঃসময়ে সর্বাপেক্ষা সহজ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কারণ তাহার মূল্য এই দেশ হইতে যতখুশি নোট ছাপিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে, আর ওদিকে শুধু ভারতবর্ষের অনুকূলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খাতায় স্টার্লিঙের অঙ্কপাত করিয়া গেলেই চলিতেছে। বাকি-খরিদের এরূপ সংসার-বহির্ভূত অভাবনীয় সুযোগ লাভ না ঘটিলে ইংলণ্ডের আজ কি দুর্গতিই না হইত। একটু ভুল বলা হইল; কারণ সেই ক্ষেত্রে শাস্ত্রে আর একটি নূতন কলা-কৌশলের আবিষ্কার হয়ত আমরা দেখিতে পাইতাম এবং শেষ পর্যন্ত দুর্গতি চিরদিন যাহাদের প্রাপ্য তাহারাই উহা ভোগ করিতেন।

এখন উল্লিখিত হিসাবের অপর একটি অংশে দৃক্‌পাত করা যাক। ব্যাঙ্কের সংস্থানের ঘরে ৩০শে জুন পর্যন্ত ১৫·৫৫ কোটি টাকার Rupee coin বা রৌপ্য মুদ্রা জমা রহিয়াছে দেখা যায়। নোটের সিকিউরিটি বাবদ ১৫½ কোটি টাকার রৌপ্য মুদ্রা আছে, ইহা কতকটা আশ্বাসের কথা—যদিও মোট নোটের তুলনায় ইহার পরিমাণ অতি নগণ্য। কিন্তু সামান্য হইলেও এতটুকু সান্ত্বনা লাভেরও উপায় নাই; কারণ Rupee coin বলিতে এতকাল যদিও আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে রৌপ্য মুদ্রাই বুঝিয়া আসিয়াছি তথাপি এ দেশের জলবায়ুর গুণে অনেকগুলি coin কাগজ হইয়া গিয়াছে! এই অবস্থাকেই সম্ভবতঃ "অভাগা যদ্যপি চায়·—" ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। এখানে আরো একটু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, Rupee coin বলিতে যে Rupee noteও বুঝিতে হইবে হিসাব দেখিয়া তাহা বুঝিবার উপায় নাই—এই কথাটি সেখানে উহ্য রহিয়াছে। তবে রিপোর্টের ২৩ পৃষ্ঠায় অন্য কথার সহিত জড়াইয়া অতি সংক্ষেপে এই সত্যটি এইভাবে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে :—

"The amount of '*Rupee Coin*' *including Govt. of India one-rupee notes* declined further from Rs. 28·00 crores to Rs. 15·55 crores as a result of increased demand by and issues to the public."

উল্লিখিত উক্তিটি হইতে এক টাকার নোট এক টাকার মুদ্রার সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া গোত্রান্তর লাভ করিয়া "মুদ্রা" পদবীপ্রাপ্ত হইয়াছে—এই সত্যটুকু জানা যায়; কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্‌টি better half, অর্থাৎ ইহা দুগ্ধ মিশ্রিত জল, না জল মিশ্রিত দুগ্ধ এবং লোকেরা কি চাহিয়াছিল এবং কি পাইয়াছে তাহা কিন্তু বোঝা যায় না।

বুঝিবার দরকারও বিশেষ নাই। কারণ ঐ রিপোর্টেরই অন্যত্র লেখা হইয়াছে :—

"Victoria and Edward VII standard rupee and half-rupee coin ceased to be legal tender with effect from the 15th May, 1943 and George V and George VI standard rupee and half-rupee coin will cease to be legal tender from the 1st November, 1943. *This marks the culmination of the policy which originated in 1893 of substituting full value silver coin by a token coin.*"

রিপোর্ট লেখকের মুন্সিয়ানার প্রশংসা করিতে হয়। কারণ তাহার লেখা পড়িয়া অনভিজ্ঞ পাঠকদের ইহাই মনে হইবে যে, খুব বড একটা আদর্শ অনুসরণ করিতে করিতে আমরা এখন যেন সেই মহৎ আদর্শের চরম লক্ষ্যস্থলে আসিয়া পৌছিয়াছি। কিন্তু সত্য কি তাহাই? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমেই জানা আবশ্যক যে, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আরব্ধ গবর্মেণ্টের যে নীতি আজ চরম পরিপূর্ণতায় আসিয়া ঠেকিয়াছে সেই নীতিটি কি? রিপোর্টের ভাষা হইতে শুধু এইটুকুই আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ণ মূল্যের রৌপ্য মুদ্রার জায়গায় হীন নিদর্শন মুদ্রাকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেই নীতির উদ্দেশ্য। তবে কি ভিক্টোরিয়া ও সপ্তম এডওয়ার্ড মার্কা হীন টাকা ও আধুলিগুলিকে যথেষ্ট হীন নহে বলিয়াই ১৯৪৩, ১৫ই মে তারিখ হইতে বরবাদ করা হইয়াছে? এবং তৎপর পঞ্চম ও ষষ্ঠ জর্জ্জ মার্কা যে টাকা ও আধুলি চলিয়াছিল, তাহাদের মূল্যও কি অধিক বিবেচিত হওয়ার দরুণ ১৯৪৩, ১লা নবেম্বর হইতে উহাদিগকেও বাতিল করা হইল? কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে এই পথ অবলম্বন করা হইল—যাহার সূত্রপাত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে? ভাষার নিঃশব্দতার

মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর চাপা পড়িয়া গেলেও মুখর ইতিহাসের মুখ কি বন্ধ করা যাইবে ?

সকল দেশের প্রধান মুদ্রাই পূর্ণ মূল্যের মুদ্রা—হীন মুদ্রা প্রধান মুদ্রার স্থান অধিকার করিয়াছে, ইহা ছুনিয়ায় আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্য করিতে যাইয়া স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণ-মানের অভাবে বহুবার ভয়ঙ্কর মার খাইয়া আমরা যখন বড় বেশী চেঁচামেচি করিতে সুরু করিলাম, তখন আমাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইল—এইবার স্বর্ণমান ও স্বর্ণমুদ্রা তোমাদিগকে দেওয়া হইবে—তবে কি জান, স্বর্ণমুদ্রা পাইতে হইলে স্বর্ণ ক্রয় করা দরকার এবং স্বর্ণ ক্রয় করিতে হইলে বহু অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং একটা কাজ করা যাক্—তোমাদের রৌপ্যমুদ্রা হইতে ।৵০/।৶০ আনা পরিমাণ রৌপ্য ধাতু কাটিয়া রাখিয়া তাহার সাহায্যে তোমাদের জন্য একটি স্বর্ণ-তহবিল (Gold Standard Reserve) খুলিতেছি। উহা যখন ক্রমে বড় হইয়া উঠিবে তখন আর চাই কি, উহার সাহায্যে তোমা-দিগকে তোমাদের বহু ঈপ্সিত স্বর্ণমুদ্রা দিতে পারিব। ইতিমধ্যে হীন রৌপ্যমুদ্রা লইয়াই তোমরা সন্তুষ্ট থাক। আমরা বলিলাম, 'তথাস্তু'—না বলিয়াই বা উপায় কি—কর্তা ইচ্ছায় কর্ম ত' ? পরিণামে কি হইল তাহা ত' দেখিতেই পাইতেছেন—জাতও গেল, পেটও ভরিল না, পূর্ণ-মূল্যের রৌপ্য মুদ্রাও হারাইলাম, স্বর্ণ মুদ্রাও পাইলাম না। এদিকে কর্তারা আমাদিগকে আশ্বাস দিতেছেন, তোমাদের জন্য যে পথে নামিয়াছিলাম সেই পথ ধরিয়া ঠিক অগ্রসর হইতেছি! কিন্তু ওদিকে লক্ষ্যবস্তু স্বর্ণমুদ্রা লাভ যে আমাদের ভাগ্যে চির অস্তমিত হইয়া গেল, তাহাতে কিছু যায় আসে না !

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে প্রবর্তিত নীতির পরবর্তী ইতিবৃত্তটুকু ভারত ইতিহাসের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ভুক্ত হইলেও এখানে তাহার

খানিকটা পুনরাবৃত্তি না করিয়া পারিলাম না। "স্বর্ণমানের প্রধান উপকরণ নিজ দেশে অবাধে স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার। এই গোড়ার অধিকারটি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের আপত্তির দরুণ (১৮৯৩ সালে) ভারতবর্ষকে দেওয়া হইল না। স্বর্ণ তহবিল ধীরে ধীরে রৌপ্যমুদ্রাকে টানিয়া লইয়া স্বর্ণমানের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে, স্বর্ণ তহবিল সৃষ্টির এই উদ্দেশ্যটিও ভারত-সচিব ব্যর্থ করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ, এই স্বর্ণ তহবিল ভারতবর্ষে না রাখিয়া স্টার্লিঙে রূপান্তরিত করিয়া বিলাতে রাখা হইল। দ্বিতীয়তঃ, এই তহবিলের একটা অংশ ভারতে রেলপথ নির্মাণে ব্যয় হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ, অতিরিক্ত টাকার আবশ্যক হইলে রৌপ্য খরিদের মূল্য দিবার জন্য স্বর্ণ তহবিলের একাংশ রৌপ্য-মুদ্রারূপে ভারতবর্ষে রক্ষিত হইল। অন্যদিকে ভারতবর্ষে স্বর্ণ পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে ভারত-সচিব বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে বিলাতী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া কাউন্সিল বিল বেচিতে স্বরু করিলেন এবং এইরূপ বেচাকেনার কোনরূপ সীমা নির্দেশ করা হইল না! ফলে বিদেশ হইতে ভারতে স্বর্ণ প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। যে স্বর্ণ ভারতের প্রাপ্য এবং যাহা ভারতে আসিতে পারিলে নানা উপায়ে ভারতের ধনবৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারিত তাহা বিলাতেই রহিয়া গেল এবং তথায় আমাদের নামে জমা থাকিলেও অল্প সুদে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে ব্যবহৃত হইতে পারিল। ইহাতে ইংলণ্ডের মর্যাদা ও ধনবল বাহিরে যেমন বাড়িয়া গেল, আমাদের ধন পরহস্তগত হওয়ায় তাহা সম্ভব হইল না। নোটের টাকা দিবার জন্য যে পৃথক তহবিল (Paper Currency Reserve) রাখা হয় তাহা হইতেও ১৯০৫ সালে ৭½ কোটি টাকার স্বর্ণ জাহাজে করিয়া বিলাতে পাঠান হয়। ইহার অনুকূলে এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, টাকা প্রস্তুতের জন্য ইংলণ্ডে রৌপ্য খরিদকালে

ভারতবর্ষ হইতে স্বর্ণ আনাইয়া লইতে তিন চার সপ্তাহ বিলম্ব ঘটিত—ইহাতে সেই অসুবিধা আর হইবে না।" (১)

সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহারই জের টানিতে টানিতে আজ এতদূর পর্যন্ত আমরা আসিয়াছি। এবার আমাদের ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর রৌপ্য 'মুদ্রা' তাহার জড় দেহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়া সূক্ষ্ম কাগজী দেহে আত্ম-বিসর্জন করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। ইহাই যদি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের আদেশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সূক্ষ্ম দেহলাভের পর আমাদের যে স্বর্গ (অর্থাৎ স্বর্ণ) লাভ হইবার কথা ছিল, তাহার কি হইল?—এই প্রশ্নের আমরা উত্তর চাই। সেই উত্তর দিবার অধিকার রিপোর্ট লেখকের আছে কি? যদি না থাকে, তবে তিনি কোন্ অধিকারে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের নীতি বা পলিসির দোহাই দিতে সাহসী হইলেন?

কাহিনী আর বাড়াইব না। "Rupee Securities" নামক হিসাবের ডানদিকের শেষ অঙ্কটির স্বরূপ বিচার করিয়াই প্রবন্ধটি শেষ করিব। ধাতু মুদ্রা যে কেবলমাত্র 'নোট'রূপ সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু অন্তরূপ সূক্ষ্ম দেহের মধ্যেও দেহরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই Rupee Securities হইতে পাওয়া যাইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট তাহার কতকগুলি সিকিউরিটি জমা রাখিয়া নোট চালাইতে পারেন। কিন্তু এইরূপ সিকিউরিটির পরিমাণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট সংস্থানের এক-চতুর্থাংশের অধিক হইতে পারিবে না। যদি এক-চতুর্থাংশ পঞ্চাশ কোটি টাকার ন্যূন হয়, তাহা হইলে পঞ্চাশ কোটি টাকা পর্যন্ত এইরূপ সিকিউরিটি নোটের জামিন স্বরূপ রাখা চলিবে। কিন্তু যুদ্ধের

(১) লেখকের "টাকার কথা"র "ভারতে মুদ্রানীতি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পর, ১৯৪১, ফেব্রুয়ারী মাসে প্রচারিত এক অর্ডিনান্সের দ্বারা এই ঊর্ধ্বসীমারেখা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্ট I. O. U. ঋণপত্রের (Treasury Bills-এর) বিনিময়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে খুশিমত নোট বাহির করিতে পারেন। ফলে, যে স্থলে ১৯৩৯-৪০ সালে rupee securities-এর পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি টাকা মাত্র, তাহাই ১৯৪২-৪৩ সালে ১১৮'৪১ কোটি টাকাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! এক সময়ে (১৯৪৩, জানুয়ারীতে) এই সিকিউরিটির পরিমাণ ১৯৪'৩৬ কোটি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল! তাহা হইলে এই ক্ষেত্রেও আমরা নোটের জামিনস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট বণ্ড ও ট্রেজারি বিল নামক I. O. U. জাতীয় ঋণপত্রকেই দেখিতে পাইতেছি। মোট কথাটা এখন তবে কি দাঁড়াইল? দাঁড়াইল এই যে, I promise to pay bearer on demand লিখিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একখানা কাগজের পরিবর্তে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের লিখিত আর একখানা I. O. U. কাগজ। দুই হরিহর আত্মার মধ্যে কাগজী কোলাকুলি!

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই বার্ষিক হিসাবটি বিশ্লেষণ করিলে শেষ পর্যন্ত যাহা দাঁড়ায় তাহা প্রায় সর্বত্রই এইরূপ। আমাদের এই 'জাতীয়' ব্যাঙ্কে ৭৪৬ ১৬ কোটি টাকার মোট বিলিকৃত নোটের দরুণ আমরা যে চারি প্রকারের সংস্থান বা সিকিউরিটি দেখিতে পাইতেছি তাহা হইতে ৪৪'৪১ কোটি টাকার স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রা বাদ দিলে, বাকি তিন দফায় যে ৭০১'৭৫ কোটি টাকার সিকিউরিটি দেখা যায় তাহার প্রায় সবটাই বিদেশী 'মুদ্রা' ও বিদেহ 'ধাতু'। স্টার্লিং হইলেন বিলাতী I. O. U., (ইনিই অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছেন)। Rupee Securities হইলেন স্বদেশী I. O. U., আর Rupee Coin হইলেন 'এনিমিক' মুদ্রা ও কাগজী নোট। অর্থাৎ লিখিত প্রতিশ্রুতি বনাম

লিখিত প্রতিশ্রুতি লইয়াই হইল মোটের উপর আমাদের জাতীয় ব্যাঙ্কের ব্যালেন্স সিট—ইহাই আমাদের ইকনমিক্স।

উপসংহারে আমাদের প্রভুবংশকে একটি অযাচিত উপদেশ দান না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই ইকনমিক্স অনুসরণ করিয়া আমরা যে ভাবে অপরিবর্তনীয় কাগজী অর্থের স্ফীতির (inflation of inconvertible paper currency-র) দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছি, তাহাতে আমাদের ফিরিবার পথও প্রায় রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। গত যুদ্ধের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সাক্ষ্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আজ আমরা আমাদের চারিদিকে ঘোর দুর্দিন ও বিশৃঙ্খলার যে ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছি তাহা আমাদের ভাবী বিনাশ ও অধঃপাতের প্রথম অঙ্ক মাত্র, ইহা যেন তাঁহারা আমাদের বিধি-নিয়োজিত অভিভাবক হিসাবে স্মরণে রাখেন।

আমাদের ব্যালান্স্‌ট্‌ বাজেট্‌

আমাদের বক্তব্য বুঝিবার পক্ষে সুবিধা হইবে মনে করিয়া আমরা প্রথমেই এক সঙ্গে কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যা দিয়া প্রবন্ধটির অবতারণা করিতেছি।

কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের মোট ব্যয় (১)

সন	দেশরক্ষা	বেসরকারী	অন্যপ্রকার	মোট
১৯৩৮-৩৯	৫২ কোটি টাকা	৩৯ কোটি টাকা	৩১ কোটি টাকা	১২২ কোটি টাকা
১৯৩৯-৪০	৫০ " "	৪৫ " "	৩০ " "	১২৬ " "
১৯৪০-৪১	৭৫ " "	৪০ " "	৩৬ " "	১৫২ " "
১৯৪১-৪২	১০৫ " "	৪৩ " "	৩৭ " "	১৮৬ " "
১৯৪২-৪৩	১৯৯ (১) "	৭৭ " "	৩৮ " "	৩১৪ " "
১৯৪৩-৪৪ (বাজেট এষ্টিমেট)	১৯৮ " "	৮৪ " "	৪৬ " "	৩২৮ " "

বাজেট ঘাটতির হিসাব (২)

(কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের)

সন	ঘাটতির পরিমাণ
১৯৩৯-৪০	×
১৯৪০-৪১	৬'৫ কোটি টাকা
১৯৪১-৪২	১২'৭ " "
১৯৪২-৪৩	৯৪'৭ " "
১৯৪৩-৪৪	৯২'৪৩ " "

(১) এই সনে বিমানঘাঁটি ইত্যাদি নির্মাণের কেপিট্যাল খরচ ধরিলে মোট ব্যয় ২৩৯ কোটি টাকা দাঁড়াইবে।

ভারত সরকারের ঋণের হিসাব (৩)

সন ১৯৩৮–৩৯

ভারতীয় 'রূপি' ঋণ	বিলাতী স্টার্লিং ঋণ	মোট ঋণ
৭৩৬'৬৪ কোটি	৪৬৯'১২ কোটি	১২০৫'৭৫ কোটি
ঐ বার্ষিক সুদ	ঐ সুদ (বার্ষিক)	মোট বার্ষিক সুদ
২৯'১২ কোটি	১৬'৬২ কোটি	৪৫'৭৪ কোটি

সন ১৯৪২-৪৩

ভারতীয় 'রূপি' ঋণ	বিলাতী স্টার্লিং ঋণ	মোট ঋণ
১৩১২'০০ কোটি	৯৩'৩২ কোটি	১৪০৫'৩২ কোটি
ঐ বার্ষিক সুদ	ঐ বার্ষিক সুদ	মোট বার্ষিক সুদ
×	×	৩৭'৭৫ কোটি

ট্যাক্স হইতে ভারত সরকারের আয়ের হিসাব (৪)

সন	ব্যবসায়ের উপর কর	ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষ কর	পরোক্ষ কর	মোট
১৯৩৮-৩৯	২ কোটি	১৪ কোটি	৫৮ কোটি	৭৪ কোটি
১৯৪২-৪৩	৩০ "	৩৭ "	৫৫ "	১২২ "
১৯৪৩-৪৪ (বাজেট বরাদ্দ)	৪৩ "	৪৭ "	৬৬ "	১৫৬ "

বাণিজ্য বিভাগ হইতে ভারত সরকারের আয়ের হিসাব (৫)

সন	রেলওয়ে	পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ	মোট
১৯৩৮-৩৯	১ ৩৭ কোটি	... ...	১ ৩৭ কোটি
১৯৩৯-৪০	৪'৩৩ "	... ...	৪ ৩৩ "
১৯৪০-৪১	১২'১৬ "	'৩৩ কোটি	১২ ৪৯ "
১৯৪১-৪২	২০'১৭ "	১'০০ "	২১'১৭ "
১৯৪২-৪৩	২০'১৩ "	২'০০ "	২২'১৩ "
১৯৪৩-৪৪ (বাজেট বরাদ্দ)	২৭'১০ "	৩'২০ "	৩০'৩০ "

বর্তমান কুরুক্ষেত্র সুরু হইবার পর ভারত সরকারের অর্থসচিব চারিটি বাজেট আমাদের সম্মুখে পেশ করিয়াছেন এবং এই অস্বাভাবিক ও অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যেও আয়-ব্যয়ের এতটা সমন্বয় সাধন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কৃতিত্ব দাবী করিয়াছেন। এই কৃতিত্ব হয়ত তাঁহার প্রাপ্য; কিন্তু তাহার জন্য আমাদের মত অত্যন্ত দরিদ্র দেশের উপর কি পরিমাণ অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়াছে তাহাও কর্তৃপক্ষের দেখা প্রয়োজন এবং এই দুর্বহ বোঝা নির্বিবাদে বহন করিবার কৃতিত্বটুকু আমাদিগকে দেওয়া উচিত।

১নং হিসাবটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, আমাদেব কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় শতকরা ২৬৯৲ টাকা অর্থাৎ আড়াই গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৪২-৪৩ সালে এই যে ২০৬ কোটি টাকার ব্যয়াধিক্য দেখা যাইতেছে তাহার ৬০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া, ৪০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়া এবং অবশিষ্ট ১০৬ (১) কোটি টাকা বাণিজ্য বিভাগের বর্ধিত আয় হইতে পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত আয়ের একটা বৃহৎ অংশও যে পরোক্ষ করের অন্তর্গত তাহা বলাই বাহুল্য। সরকারী ঋণের হিসাবটি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, রূপি ঋণের পরিমাণ ৭৩৬·৬৪ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪২-৪৩ সালে ১৩১২ কোটি টাকা হইয়াছে; পক্ষান্তরে স্টার্লিং ঋণ হ্রাস পাইয়া ৪৬৯·১২ কোটি টাকা হইতে ৯৩·৩২ কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। মোট দেনার পরিমাণ ২০০ কোটি টাকা (১২০৫·৭৬ কোটি স্থলে ১৪০৫ কোটি) বৃদ্ধি পাইলেও মোট দেয় বার্ষিক সুদ ৮ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কারণ বিলাতী স্টার্লিং দেনা পরিশোধ করিয়া ভারতে যে নূতন ঋণ গ্রহণ করা

(১) ইহা গ্রোস ইন্‌কাম—নেট ইন্‌কাম ৫নং হিসাবে দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে তাহার সুদের হার ও সর্তাদি আমাদের পক্ষে পূর্বাপেক্ষা অনেকটা অনুকূল হইয়াছে।

আমাদের ঋণের পরিমাণ যে মোটের উপর ২০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার একটী মোটামুটি হিসাব আমরা এইভাবে দিতে পারি: যুদ্ধের পরবর্তী এই কয়বৎসরের বাজেট ঘাটতি—১১৩·৯ কোটি টাকা (২নং হিসাব দ্রষ্টব্য); বাণিজ্য বিভাগকে ঋণদান—৫৯ কোটি (ইহার সুদ পাওয়া যাইবে); ১৯৪২-৪৩ সালে 'কেপিট্যাল' খাতে বিমানঘাটি, নূতন টেলিফোন লাইন ইত্যাদি নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠার খরচ—৪৯·১৪ কোটি টাকা।

উপরে আমরা যুদ্ধের দরুণ আমাদের উপর অতিরিক্ত চাপের যে হিসাব দিয়াছি তাহা অত্যন্ত গুরুভার হইলেও সম্ভবতঃ এতটা মারাত্মক হইতে পারিত না, যদি বাজেটের বহিভূ'ত বিরাট ব্যয়ভার বহনের দায় ও দায়িত্ব বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার গোপনে আমাদের উপর চাপাইয়া না দিতেন। আমাদের বাজেটে না দেখাইয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার দরুণ ভারত গবর্ণমেণ্ট যে টাকা ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন তাহার হিসাব গোপনে থাকিলেও গৌণ প্রমাণ হইতে তাহার একটা আন্দাজ করা যাইতে পারে। ১৯৪১-৪২ এবং ১৯৪২-৪৩ এই দুই বৎসরে এইরূপ বাজেট-বহির্ভূ'ত রীতিবিরুদ্ধ ব্যয়ের পরিমাণ ৬০০ কোটি টাকারও ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, আমরা অনুমান করিতেছি। সেই অনুপাতে ১৯৪৩-৪৪ সালের জন্য আমরা এই বাবদ আরও ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় ধরিয়া রাখিতে পারি। এই হিসাব হইতে তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ১৯৪১-৪২ হইতে ১৯৪৩-৪৪,—এই তিন বৎসরে প্রকাশ্য বাজেটে যে পরিমাণ টাকা দেশরক্ষার্থ ব্যয় করা হইতেছে তাহারই প্রায় দ্বিগুণ টাকা ভারত গবর্ণমেণ্ট বাজেটে উহার সংস্থান বা উল্লেখ না করিয়া অপরের পক্ষে ব্যয় করিয়া চলিয়াছেন। এতগুলি টাকা

তাহা হইলে কোথা হইতে আসিতেছে? ট্যাক্স হইতে নয়, অতিরিক্ত ধার করিয়া নয়, সরকারী রেলওয়ে এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের আয় হইতেও নয়—কারণ তাহা হইলে এই টাকাকে আমরা বাজেটের মধ্যে দেখিতে পাইতাম। ইহা দায়িত্বশূন্য গবর্ণমেন্টের জারজ সন্তান বলিয়াই ইহার আবির্ভাব বা অস্তিত্বকে যথাসম্ভব গোপন বা অপ্রকাশিত রাখিতে হয়—কারণ এই টাকার প্রকৃত জনক হইল ছাপাখানা এবং এইরূপ দূষিত টাকা হইতে যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি সৃষ্টি হয় তাহারই নাম হইল 'ইনফ্লেশন'। একমাত্র ভারত গবর্মেণ্ট ব্যতীত যুদ্ধরত আর সকল দেশই এই দারুণ যুদ্ধব্যাধির বীজাণুকে সহস্র হস্ত দূরে রাখিয়া চলিয়াছে। কারণ ধনী ও দরিদ্রের অবস্থাবৈষম্যকে প্রবলতর করিতে, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীকে পথে বসাইতে, রাতারাতি কতকগুলি দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থান্ধ নূতন ভূঁইফোড় ধনী সৃষ্টি করিতে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিপদ টানিয়া আনিতে ইহার মত দ্বিতীয় শত্রু আর মানবের নাই।

বাজেটের বহির্ভূত ও রীতিবিগর্হিত এইরূপ কার্যের ফলে গবর্ণমেন্টের 'ইন্‌ফ্লেশন'রূপ দুষ্কর্মটিই যে শুধু চাপা পড়িয়া যাইতেছে তাহা নহে, পরন্তু আমরা এই যুদ্ধের দরুণ কী ভয়ঙ্কর ক্ষতি স্বীকার করিয়া মিত্রশক্তিবর্গকে কতটা সাহায্যদান করিতেছি, তাহাও গোপন থাকিয়া যাইতেছে। যে অনির্বাণ চিতা তোমরা সকলে মিলিয়া জ্বালিয়াছ তাহারই কাষ্ঠ জোগাইতে গিয়া আমাদের অবস্থা এমন চরমে উঠিয়াছে যে, দেশের অসংখ্য নর-নারী-শিশু আজ গাছের শুক্‌না পাতার মত অনাহারে রাস্তার ধারে ঝরিয়া পড়িতে সুরু করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, যাঁহাদের বিশ্ববিস্তৃত প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য আমরা প্রাণপাত করিতেছি তাঁহাদেরই অনেকে এমন ভাব দেখাইয়া থাকেন যে,

তাঁহারাই যেন আমাদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করিয়া, অপর জাতির পরাধীনতা হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের মাথা কিনিয়া রাখিয়াছেন! অন্যে পরে কা কথা—আমাদের বিলাতী অর্থসচিব সব জানিয়া শুনিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলিতে পারিলেন: "The Sterling balances arose not only from goods exported out of India or services rendered in other theatres of war, but that, in so far as under the Financial Settlement with His Majesty's Government, the whole cost of the defence of India was not borne by India, the remainder of the cost of defending India and the measures taken in India became part of the sterling balances."

ইহার তাৎপর্য এই যে, ইংলণ্ডের নিকট পণ্য ও শ্রম বিক্রয় করিয়া আমাদের যে অনেকগুলি স্টার্লিং "প্রাপ্য" হইয়াছে তাহার সবটা ন্যায়তঃ আমাদের প্রাপ্য নহে। কারণ ভারতরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয়ভার আমরা বহন করিতেছি না, বৃটিশ সরকারের সহিত আমাদের Financial Settlement অনুযায়ী তাহার একটা অংশ উঁহারা দিতেছেন অর্থাৎ দিবেন এবং তাহাই ভারতের "প্রাপ্য" মোট স্টার্লিঙের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে! এইরূপ স্বার্থান্ধ হৃদয়হীন উক্তির জুড়ি মেলা ভার। এই সম্পর্কে অধিক আলোচনা করিবার পূর্বে আর একটি বিষয় আমাদের ভাবিবার আছে। আমাদের মধ্যে যাহাদের গাছে কাঁঠাল দেখিলেই গোঁফে তেল দিবার অভ্যাস আছে, ইংলণ্ডের বাগানে আমাদের জন্য চিহ্নিত স্টার্লিঙের মোটা কাঁদি দেখিয়া এখন হইতে যাহাদের রসনায় লালা নিঃসরণ হইতেছে, তাহাদের একটু সাবধান হওয়া দরকার। কারণ ন্যায়তঃ যাহা আমাদের প্রাপ্য নহে,

আইনতঃ তাহা আমাদের প্রাপ্য হইলেও (হউক সেই আইন ইংরেজেরই তৈরী), শেষ পর্যন্ত উহা পাওয়া যাইবে ত? Abnormal War Surplus বা War Profiteering-এর বদ্‌নাম বহন করিয়া আমাদের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কদলী ভক্ষণই সার হইবে না ত? কিন্তু তাহা হইলে, প্রভু, আমাদের যে দু'কূলই যাইবে। আর কেহ না জানিলেও তুমি ত জান, 'লাভের আশায় নহে, তোমারই স্থিতি-ও লয়-বিজড়িত মুহূর্তে তোমারই প্রয়োজনে ও দাবীতে আমরা আমাদের সব কিছু দিয়াছি, ভবিষ্যতে বিজয়-উৎসবের দিনে তোমারই নিজ হাত হইতে স্টার্লিঙের জয়-মাল্যটি পরিব বলিয়া!

যাক সে ভবিষ্যতের কথা। এখন যাহা বলিতেছিলাম—অর্থ-সচিবের অভিভাষণটি পড়িলে ইহাই মনে হইবে যে, একমাত্র ভারতবর্ষের স্বার্থ ও মঙ্গলের জন্যই অ্যাংলো-আমেরিকা বর্তমান মহাযুদ্ধে এদেশে এই বিরাট যুদ্ধের ঘাঁটি ও শিবির স্থাপন করিয়াছেন এবং তথা হইতে ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে এসিয়া, আফ্রিকা, এমন কি ইয়োরোপেরও কোন কোন ভূখণ্ডে মরণ পণ করিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া চলিয়াছেন। ভারতের চারি পার্শ্বে এই যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষই যেন দায়ী, ইহাতে অ্যাংলো-আমেরিকার কোনরূপ দায় বা দায়িত্ব নাই। একদিকে ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, ডাচ দ্বীপপুঞ্জ, অন্যদিকে ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকা, এমন কি ফ্রান্স, ইটালি—যেখানেই ভারতীয় সৈন্যরা লড়িতেছে, তাহাই যেন ভারত-রক্ষার লড়াই! সুতরাং দূর-বা-মধ্য-প্রাচ্যে, আফ্রিকায়, এমন কি ইয়োরোপে লড়িবার জন্য ভারতবর্ষ যত পণ্য ও শ্রম যোগাইতেছে এবং ভারত-গবর্মেণ্ট যত অর্থ ব্যয় করিতেছেন, তাহার সবটাই বোধ হয় আমাদের দেওয়া উচিত ছিল। আমরা তাহা না দেওয়ায় এবং ইংলণ্ড উহার একটা অংশ ভবিষ্যতে দিবে বলিয়া স্টার্লিঙের খত লিখিয়া দেওয়ায়,

আমাদের পক্ষে মহা অনুদারতা এবং উহাদের পক্ষে মহানুভবতা প্রকাশ পাইতেছে! এই জন্যই আমাদের অর্থ-সচিব উহাদের হইয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমরা কিন্তু এমনি নিমকহারাম যে, আমাদের মন এইরূপ বাক্যেও প্রবোধ মানিতেছে না। আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি, বাঘে ও মহিষে লড়াই বাধিলে উলুখড়ের যে অবস্থা হয় আমাদের সেই অবস্থা হইয়া উঠিয়াছে। মহিষের ভোগ-দখলের অধিকার মানিয়া নিয়া উলুখড় আজ দেড় শত বৎসরের অধিক কাল তাহার সহিত ঘর-সংসার করিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া স্বজাতি, স্বগোত্র বন্ধুদের সহিত মান, সম্মান, ইজ্জতের কথা নিয়া তোমরা লড়াই সুরু করিয়া দিবে এবং উহা আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণ, দুর্বল দেহ উলুখড়ের উপর চাপাইয়া দিবে এবং বলিবে, নইলে তোকে বাঘে খাইবে— ইহাতে কিন্তু আমরা মোটেই সান্ত্বনা পাইতেছি না। যুদ্ধের দরুণ নানা অভাব, নানা বিড়ম্বনা ও ক্লেশ যখন আর সহিতে পারি না, তখন মনের মধ্যে কেবলই এই প্রশ্ন উঁকি মারিতে থাকে—অতঃ কিম্‌? যুদ্ধ যেদিন শেষ হইবে, বিজয়লক্ষ্মী জয়-মাল্যে যেদিন অ্যাংলো-আমেরিকা ও রুশিয়াকে বরণ করিবে, আমাদের দুঃখের নিশি সেইদিন ভোর হইবে ত? যুদ্ধের বোঝা যেমন আমাদের পক্ষেই সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে, যুদ্ধোত্তর সমস্যাও আবার আমাদের জন্যই সর্বাধিক কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠিবে না ত?

সে প্রশ্নও এখন চাপাই থাক। ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করিয়া যেখানে যত লড়াই হইতেছে তাহার ষোল আনা দায়টা কি করিয়া আমাদের হইতে পারে, তাহারই বিচারে পুনরায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্‌। এই যুদ্ধ ঘোষণা আমাদের মত লইয়া কিংবা আমাদিগকে জানাইয়া করা হয় নাই। সন্ধি করিবার সময়ও আমাদের মতামতের দরকার হইবে

না। মানুষ যুদ্ধ করে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য, কিংবা অন্য দেশের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার জন্য, কিংবা স্বদেশের বা বিদেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিবার জন্য। আমরা লড়াই করিতেছি, ভারত-রক্ষার জন্য (For "defence of India")। সে ভারত স্বাধীন কি পরাধীন,—তোমাদের কি আমাদের, সে কথাটা উহ্যই থাকিতেছে। আর লড়িতেছি, জার্মানী ও জাপান অধিকৃত দেশগুলির পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া ইয়োরোপের দেশগুলিকে স্ব স্ব স্বাধীনতায় এবং এসিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে স্ব স্ব পরাধীনতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য। স্ব স্ব স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার গৌরব অ্যাংলো-আমেরিকার ও রুশিয়ার, নূতন করিয়া পরাধীনতা যদি এই যুদ্ধের পর কাহারো ভাগ্যে ঘটে, তবে তাহার কলঙ্ক ও নিন্দা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাপ্য হইবে আমাদের! শক্তির প্রাধান্য ও দুনিয়ার প্রভুত্ব লইয়া জার্মানী, ইটালি ও জাপানের সহিত ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রুশিয়ার লড়াই চলিয়াছে। ইহার মধ্যে আমরা মাত্র নিমিত্তরূপে বিরাজ করিলেও প্রভুপক্ষ লইয়া সাধ্যাতীত লড়িতেছি। ভারতবর্ষ হইতে চারিদিকে সাঁড়াশি আক্রমণ চালাইবার যেরূপ স্বাভাবিক সুবিধা রহিয়াছে, মিত্রপক্ষের আর কোন দেশ হইতে এইরূপ সুবর্ণসুযোগ লাভের সম্ভাবনা ছিল না। এই বিরাট দেশের বিপুল নৈসর্গিক সম্পদ ও জনবলের উপর অবিসম্বাদী প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ইংলণ্ড নির্বিবাদে আমাদের নিকট হইতে এই দুঃসময়ে যাহা পাইয়াছে, নিজের দেশের লোকও তাহাকে ইহা দিতে পারিত না—এতখানি দুঃখকষ্ট বরণ করিয়া।

ইহার পরও যদি বলা হয়, এই দেশ হইতে যুদ্ধের জন্য যত পণ্য নেওয়া হইয়াছে, যত সৈন্য লড়াই করিতেছে, যত অর্থ ব্যয় হইতেছে, তাহা একমাত্র ভারতেরই দায় এবং তাহারই দেয়—ইহার মধ্যে

যতটুকু তোমরা তোমাদের স্টার্লিং মুদ্রায় যুদ্ধোত্তরকালে পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছ তাহাই হইবে তোমাদের অনুগ্রহের দান, তাহা হইলে এই কথাগুলি কি কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত বোধ হইবে না? তার চেয়ে আমরা যদি বলি, সবটাই তোমার দায় ও তোমার দেয়, তাহার মধ্যে আমি যাহা দিতেছি তাহাই হইবে আমার (রাজভক্তির) দান—তাহা হইলে ইহাই কি প্রকৃত ও পূর্ণ সত্য না হইলেও, অধিকতর সত্য হইবে না? কিন্তু কথাটাকে ঘুরাইয়া প্রচার করিবার ফলে এবং গবর্ণমেণ্ট যে বার্ষিক ৩০০ কোটি টাকা বাজেটে উল্লেখ না করিয়া পিছনের দরজা দিয়া ব্যয় করিতেছেন তাহা বিশ্ববাসীর নিকট গোপন থাকিবার দরুণ, এত দিয়া এত করিয়াও দুনিয়ায় আমরাই ঋণী রহিয়া গেলাম! ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের পরিহাস আর কি হইতে পারে!

লেণ্ড-লিজ রসায়ন

তিলের আধার তৈল কিংবা তৈলের আধার তিল—এইরূপ প্রশ্ন লইয়া বহুকাল হইতে এ দেশীয় পণ্ডিতের মধ্যে বিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু আধুনিক কালে ইহা অপেক্ষাও কঠিন, অথচ ঠিক এই জাতীয় প্রশ্নেরই সমাধান আমাদিগকে করিতে হইতেছে, পণ্ডিতদের বিচার-সভায় ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় দিবার জন্য নহে, জীবনমরণ-ক্ষেত্রে নিতান্তই প্রাণরক্ষার জন্য। বর্তমান প্রশ্ন হইতেছে—কে কাহার জন্য লড়িতেছে? গোটা ভারতবর্ষটাকে যুদ্ধের শিবিরে পরিণত করিয়া উহারা আমাদের জন্য লড়িতেছে, না, আমরা উহাদের জন্য লড়িতেছি? অ্যাংলো-আমেরিকা বলিতেছে, আমাদের জন্যই উহারা লড়িতেছে এবং ইহার (আর্থিক) দায় আমাদেরই। আর আমরা ভাবিতেছি, দায় উহাদেরই, এবং উহাদেরই সম্ভ্রম ও সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে যাইয়া আমরা ধনেপ্রাণে সর্বস্বান্ত হইতেছি। তিল ও তৈলের মধ্যে এই যে অতি-আধুনিক মতদ্বৈধ, কে ধারক এবং কে ধারিত, কে উপকারক এবং কে উপকৃত—এই প্রশ্ন লইয়া যে মতান্তর তাহার মীমাংসা অবশ্য মোটেই আমাদের উপর নির্ভর করিয়া নাই। কারণ আমাদের প্রভুগণ শুধু যে চিরকাল প্রচার করিয়াই আসিয়াছেন তাহা নহে, মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করিয়া আসিতেছেন যে, এসিয়া, আফ্রিকা, ও অন্যান্য দেশের কালা ও রংচটা আদমিদের উদ্ধারের বিধিদত্ত ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্যই তাঁহারা পুরুষানুক্রমে জীবন উৎসর্গ করিয়া চলিয়াছেন। শ্বেত মনুষ্যের এই মহৎ মিশনের গুরু-ভার

(whitemen's burden) বহন করিবার প্রোপাগাণ্ডা পৌনঃপুনিক আবৃত্তির ফলে আজ তাহাদের নিজেদের অন্তরের মধ্যেই এমন দাগ কাটিয়া বসিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের পরোপকারের ঠেলায় জীবন অতিষ্ঠ ও দুর্বহ হইয়া উঠিতে চাহিলে যদি কেহ কখনও নিরুপায় হইয়া হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে, তাহা হইলে সত্যই আমাদের প্রভুরা বিস্মিত হন, ভাবেন "এ আবার কি! লোকগুলির রকম দেখ না!" তীক্ষ্ণ ও বিস্মিত দৃষ্টির ভিতর দিয়া যে ভাষা নির্গত হয় তাহা এই—"দেখছ নিমকহারামি! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! আচ্ছা!" সুতরাং কে ধারক ও কে ধৃত এবং কে উপকারী ও কে উপকৃত—সে প্রশ্নের আর মীমাংসার প্রয়োজন নাই, তাহা পূর্ব হইতেই সিদ্ধ হইয়া আছে।

কিন্তু তাঁহারা দয়া করিয়া এই আশ্বাস এবার আমাদিগকে দিয়াছেন যে, দায় যদিও আমাদের, তবুও তাহার কতকাংশ তাঁহারা গ্রহণ করিবেন। তার জন্য হিজ ম্যাজেষ্টিজ গবর্মেণ্টের সহিত "আমাদের" গবর্মেণ্টের একটা আর্থিক চুক্তি (Financial Settlement) ইতিপূর্বেই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং আমেরিকার গবর্মেণ্টের সঙ্গেও একটা পারস্পরিক চুক্তি (Reciprocal Agreement) শীঘ্রই সম্পাদিত হইবার কথা চলিতেছে। ব্রিটেনের সঙ্গে ফিনান্শিয়াল সেট্‌ল্‌মেণ্ট সম্পর্কে আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের অন্তর্গত নহে। সুতরাং সে বিষয়ে এখানে বিশেষ কিছু বলিব না, শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদিও তিল ও তৈলের বিরোধ প্রকারান্তরে এ ভাবে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে যে, তাহাদের উভয়েই উপকারী এবং উভয়েই উপকৃত (এই উদার নিষ্পত্তির জন্য কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন), তথাপি উভয়ের মধ্যে কে কতখানি উপকারী এবং কে কতখানি উপকৃত, তাহার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে কতকগুলি

'ফরমূলা' বা সূত্র নির্ধারিত হইয়াছে, যাহার ব্যাখ্যার উপর এই প্রশ্নের সমাধান এবং ব্যয়ের বণ্টন নির্ভর করিবে। সেই সব সূত্র প্রণয়ন ও উহাদের ব্যাখ্যার ভার আমাদের পক্ষেও উহারাই পরম উদারতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন (যেমন সর্বদা করিয়া থাকেন)। এবং এইরূপ ব্যাখ্যার ফলে এদেশে যুদ্ধের দরুণ যে খরচ হইতেছে, তাহার মধ্যে আমাদের দেয় অংশের পরিমাণ শনৈঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। তবুও ইহাই আমাদের সান্ত্বনা যে, তৈলের উপকারী হিসাবে তিলও একটা আংশিক 'কাগজী' ডিক্রী পাইয়াছে, যদিও ইহার ফলে যুদ্ধের নামে আমাদের দেশের সৈন্য-সামন্ত, লোক-লস্কর, পণ্যসম্ভার পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে পাঠাইবার লজ্জা ঢাকিবার জন্য কোন আবরণের প্রয়োজনও প্রভুপক্ষের এবার আর রহিল না।

এই তো গেল ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধের খরচ-সংক্রান্ত আমাদের বোঝাপড়ার কথা। তাহার উপর এবার আবার নূতন করিয়া আমেরিকা আমাদের পরিত্রাণার্থ সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী সহ আমাদেরই মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার দাবীও উপকারীর দাবী; কিন্তু তিনি উপকারের প্রত্যুপকার বড় একটা চান না, শুধু যেন দিয়া যাইবার জন্যই তাঁহার আবির্ভাব। মিত্রপক্ষের কেহ আহ্বান করিলেই তিনি নিজ খরচে তথায় যাইয়া থাকেন এবং নিজ হইতে ঔষধ পথ্য দিয়া রোগীর জন্য যথাসাধ্য করিয়া থাকেন; 'ফী' তাঁহার চাই না, ভাবসাব দেখিয়া মনে হয়, দেবতার নামে ভোগ দিবার জন্য ৵৫ পাঁচটি মাত্র পয়সা পাইলেই যেন তিনি খুশি! এই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে সিদ্ধিলাভের জন্য যে অদ্ভুত দাওয়াই ইঁহারা দুনিয়ার দরবারে পেশ করিয়াছেন, তাহার মন্ত্রপূত সংক্ষিপ্ত নাম—"লেণ্ড ও লিজ"। আমরা সকলেই এই নাম শুনিয়াছি, কিন্তু পরিচয় এখনও পাই নাই। সম্যক পরিচয় পাইতে আরও অনেক বিলম্ব হইবে। তথাপি ইহার বিষয়ে আর

অধিক আলোচনা করিবার পূর্বে ইহার জন্মেতিহাস ও বাহিরের কাঠামোর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া আবশ্যক।

১৯৩৯, সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমান যুদ্ধ শুরু হয় এবং ১৯৪০, জুন মাসের মধ্যে ফ্রান্সের পতন ঘটে। এদিকে গত যুদ্ধের দেনা না দেওয়ার দরুণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্টের সহানুভূতি পুরাপুরি ইংলণ্ডের দিকে থাকিলেও নগদ মূল্য (ডলার) ভিন্ন ইংলণ্ডকে যুদ্ধের মালমসলা, সাজসরঞ্জাম কোন কিছু দিয়াই সাহায্য করা আমেরিকার পক্ষে আইনত অসম্ভব হইয়া উঠে। ফলে আমেরিকার (cash and carry) ফেল কড়ি, দাও পাড়ি—এই দাবি মিটাইতে গিয়া যুদ্ধের দেড় বৎসরে ইংলণ্ডের অবস্থা সঙ্গিন হইয়া পড়ে—ভারতবর্ষের সহিত বিরাট বাকি কারবার সত্বেও। ফ্রান্সের পতন, ইংলণ্ডের একাকিত্ব, তদুপরি তাহার নিকট সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের উল্টা সাহায্য দাবী, এইরূপ ঘোর দুর্দিনে একমাত্র ভারতবর্ষই তাহার বিরাট ভাণ্ডার ইংলণ্ডের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল সত্য; কিন্তু তাহাতেও ঘূণ ধরিয়াছিল। আন্তর্জাতিক অবস্থা যখন ইংরেজ ও তাহার ঔপনিবেশিক স্বজাতিগণের পক্ষে এতাদৃশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ভাগ্যদেবতার পূজা দিবার জন্য যখন সম্মুখে "blood, sweat and tears" ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট তাঁহার পূর্বাধিকারী উড্রো উইলসনের মর্মান্তিক লজ্জা ও ব্যর্থতা এবং তাঁহারই আমলে উপকৃত অধমর্ণগণের ঋণ অস্বীকার (repudiation of war debts by England, France and Italy) ইত্যাদি পূর্ব অপমান সব বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়া সৈন্য-প্রেরণ ব্যতীত সর্বপ্রকারে ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং এই ব্যাকুলতা হইতেই লেণ্ড-লিজ-রূপ অভিনব মার্গটির আবিষ্কার সম্ভব হইল। দেশের ও কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধী মনোভাব পূর্ব অভিজ্ঞতার

দরুণ যথেষ্ট প্রবল থাকায়, প্রেসিডেন্ট সাহেবকে ধীরে ধীরে অত্যন্ত কৌশলে অগ্রসর হইতে হয় এবং ১৯৪১, মার্চ মাস নাগাদ ইহাকে তিনি অভীপ্সিত আইনে পরিণত করিতে সক্ষম হন। এই আইনের প্রচারিত "উদ্দেশ্য" হইল: "To promote the defence of the U. S. A."—(শত্রুর আক্রমণ হইতে) যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষার ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা (অপর কাহাকেও রক্ষা বা সাহায্য করা কিন্তু নহে!)। আত্মরক্ষার দোহাই না দিলে শুধু অপরকে রক্ষার মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে আমেরিকার জনমত এবার কিছুতেই সম্মতি দিবে না—এই আশঙ্কা হইতেই যে উদ্দেশ্যটাকে এ ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য ইহার মধ্যে সত্য যে একেবারেই ছিল না, তাহাও বলা চলে না। কারণ ১৯৪১, ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা যখন প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে, তখন প্রায় সমস্ত ইউরোপ-ভূখণ্ড জার্মানদের অধীন; রুশিয়ার অবস্থাও যায়-যায়,—লেনিনগ্রাড ও মস্কোর বহির্দ্বারে আসিয়া জার্মানীর দুর্দমনীয় সেনানী শীতের আবির্ভাবে শিবির ফেলিয়াছে। আমেরিকা পৃথিবীর অপর গোলার্ধে, আতলান্তিক মহাসাগরের অপর তীরে অবস্থিত হইলেও, বর্তমান যুগে পৃথিবীর দূরতম অংশও আক্রমণের বা নাগালের একেবারে বাহিরে নয়। সুতরাং সেই দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে ইংলণ্ডকে লেণ্ড-লিজ সাহায্য-দানের জন্য প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট প্রথমতঃ যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক নহে—যদিও আমরা মনে করি, তিনিই একমাত্র রাষ্ট্রনেতা ছিলেন, যিনি এই যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়িয়া নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখিতে পারিলে দুইটি সাম্রাজ্য-বাদী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে হয়তো একটা আপোষ-মীমাংসা করিতে পারিতেন। অবশ্য তাহা সহজসাধ্য হইত না; কারণ ইউরোপের power politics-এর মধ্যে স্বার্থের সামঞ্জস্য আপোষে হওয়া কঠিন।

তাহার উপর যুদ্ধের বিপাকে পড়িয়া আশু প্রাণরক্ষার জন্য এক ধর্মাবলম্বী অপর ধর্মাবলম্বীর শয্যাসঙ্গী (না সঙ্গিনী !) হইয়া বসিয়া আছে। এই অবস্থায় আমেরিকার মত বিত্ত ও শক্তিশালী নিরপেক্ষ জাতির পক্ষেও শুধু মিষ্ট কথা বলিয়া বা চোখ রাঙাইয়া এই বিশ্ব-বিরোধের জটিল গ্রন্থি ছেদন করা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ। না হইলে নিরপেক্ষতার পরিণামফল ক্লীবত্বের কলঙ্কটীকা মস্তকে বহন করাই আমেরিকার সার হইত। আমেরিকার শক্তি ও প্রতিপত্তি তাহার সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করে না— নগণ্য ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে বাদ দিলে সাম্রাজ্য বলিতে তাহার বিশেষ কিছু নাইও। সেইজন্যই আমরা অনেকে এবারকার লড়াইয়ে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে নিখিল-বিশ্বের তরফে সেনাপতি সালিশ বা Field-Marshal Arbitrator হিসাবে দেখিতে চাহিয়াছিলাম।

কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, আধুনিক যুগে কোথাও সমরাগ্নি একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, কোনও প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকা, আর আত্মহত্যা করিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে অবসর লওয়া প্রায় একই কথা। আরও ভুলিয়াছিলাম যে, পাশ্চাত্য পলিটিক্সে নিছক ন্যায়পরতা বা abstract justice বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। আত্মপরতাকে সেখানে ন্যায়ের মুখোশ ও পরার্থপরতার বহির্বাস পরিধান করিয়া যথাসম্ভব আত্মগোপন করিয়া থাকিতে হয়। সেখানে স্থূল লোভ ও লোলুপতার সহিত উদারতা ও মহানুভবতার সূক্ষ্ম রস মিশিয়া এমন অভিনব মিক্‌স্‌চার অধুনা প্রস্তুত হইতেছে যে, ইহার মধ্য হইতে একতে বাদ দিয়া অপরকে বাছিয়া লওয়া আমাদের দেশের মূর্খ-পণ্ডিতদের পক্ষে দুঃসাধ্য কর্ম। অথচ এইরূপ মিক্‌স্‌চার তৈরি করিতে এবং তাহার ব্যবচ্ছেদ করিতে পারাই হইল পাশ্চাত্য পলিটিক্স ও পাশ্চাত্য ধর্ম। রসের ক্ষেত্রে দি সাব্লাইম অ্যাণ্ড

দি রিডিকুলাস যেমন অনেক সময় গা-ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া বসিয়া থাকে এবং অপার্থিবকেই অকিঞ্চিৎকর এবং অকিঞ্চিৎকেই অপার্থিব বলিয়া ভ্রম হয়, তেমনই রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশ্বজনীন প্রেম ও আত্মসর্বস্ব ক্ষুধা দিব্য অঙ্গাঙ্গী হইয়া বসিয়া আছে—যদি বিশ্বজনীন প্রেমের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে যাও, দেখিবে, সর্বগ্রাসী ক্ষুধার করাল মূর্তি মুখব্যাদান করিয়া আছে তোমাকে গ্রাস করিবার জন্য। আর যদি রাক্ষসী ক্ষুধার দলে ভিড়িতে চাঁও, তবে শক্তির পরীক্ষা তোমাকে আগে দিতে হইবে, নহিলে বিশ্বজনীন প্রেমের খরস্রোতে ভাসিয়া কিংবা তলাইয়া যাইতে হইবে।

লেণ্ড-লিজের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আমরা দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এখনও ইহার বাহ্যিক কাঠামোর পরিচয় আমরা পাই নাই। এইবার সেই পরিচয় লইবার চেষ্টা করা যাক। লেণ্ড-লিজ ব্যবস্থার মূল সূত্রগুলির সংক্ষিপ্তসার এইরূপ :—

(১) মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে যে কোন দেশ যুদ্ধের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সাজসরঞ্জাম ও সংবাদ পাইবার সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিবে, যুক্তরাষ্ট্র তাহাকেই এইরূপ সাহায্য দান করিবে—যদি সেই দেশের আত্মরক্ষার উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিশেষভাবে নির্ভর করে বলিয়া মনে করা হয়।

(২) যে দেশ সাহায্য প্রার্থনা করিবে, তাহার যদি উল্লিখিত সাজসরঞ্জাম ও সংবাদের মূল্য দিবার মত উপযুক্ত পরিমাণ ডলার না থাকে, তাহা হইলেও প্রার্থিত সাহায্য পাইবার পক্ষে কোনরূপ বাধা হইবে না।

(৩) যে সাজসরঞ্জাম বা সার্ভিস সাহায্য হিসাবে পাওয়া যাইবে, যুক্তরাষ্ট্রের সমর-বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার পরামর্শ বা সম্মতি ব্যতিরেকে উহাদের বণ্টন বা বিলিব্যবস্থা করা চলিবে না।

(৪) যে যুদ্ধ-সরঞ্জামাদি লেণ্ড-লিজ বিধানানুযায়ী পৃথক-রক্ষিত তহবিল হইতে না দিয়া আমেরিকার আত্মরক্ষার সাধারণ তহবিল হইতে দেওয়া হইবে, তাহার মূল্য কোন একটি দেশবিশেষের জন্য ১৩০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি হইতে পারিবে না।

(৫) লেণ্ড-লিজ বিধান শুধু সেই সব যুদ্ধ-সরঞ্জাম সরবরাহের বেলায়ই প্রযোজ্য হইবে, যাহা অন্যত্র কোথাও বাজারে পাওয়া যায় না। বাজারে প্রাপ্তব্য যুদ্ধসামগ্রী হইলে নগদ মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে।

(৬) বিভিন্ন গবর্মেণ্টের মধ্যেই শুধু লেণ্ড-লিজ বিধানানুযায়ী লেনদেন হইতে পারিবে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত এইরূপ কারবার চলিবে না।

(৭) লেণ্ড-লিজ সাহায্যের জন্য নগদ মূল্য বা পণ্য দিবার প্রয়োজন না থাকিলেও, সাহায্যপ্রাপ্ত দেশকে প্রতিদানে যুদ্ধের জন্য তাহার সাধ্যমত সর্বপ্রকার যুদ্ধ-সরঞ্জাম, শ্রম ও সুযোগ-সুবিধা দান করিতে হইবে।

(৮) নগদ অর্থ, জিনিসপত্র বা সম্পত্তি (ইন ক্যাস, কাইণ্ড অর প্রপার্টি) দ্বারা লেণ্ড-লিজ সাহায্যের প্রতিদান করাও চলিবে; অধিকন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ হইতে অন্যভাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপকার পাওয়া গেলে এবং উহা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের নিকট যথেষ্ট বিবেচিত হইলে, ওই উপকার বেনিফিট বা প্রতিদানরূপে গণ্য হইতে পারিবে।

(৯) আমেরিকার নিরাপত্তার জন্য অন্য দেশ কর্তৃক সামরিক সাহায্য-দান কিংবা অন্য দেশে আমেরিকার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ-শিবির প্রতিষ্ঠা করিলে সেই দেশ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা, সরবরাহ এবং সংবাদ (সার্ভিস, সাপ্লাইজ অ্যাণ্ড ইন্‌ফর্‌মেশন) প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অভিরুচি অনুযায়ী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপকার কিংবা প্রতিদানরূপে গণ্য হইতে পারে।

(১০) সর্বোপরি, এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকার যে মাস্টার-এগ্রিমেণ্ট(১) সম্পাদিত হইয়াছে, যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যনীতি বিষয়ে মিত্রপক্ষীয় অন্যান্য দেশের সহিতও যদি তদনুরূপ একটা বোঝাপড়া বা শর্ত সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ওই দেশকেও আর পৃথকভাবে লেণ্ড-লিজ দেনা পরিশোধ করিতে হইবে না—ইহাকেই পরোক্ষ প্রতিদান বলিয়া প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এখন ইংলণ্ডের সহিত আমেরিকাব যে "মাস্টার-এগ্রিমেণ্ট" সাধিত হইয়াছে, তাহাব সার-মর্ম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহা অনেকটা এইরূপ :—উভয় রাষ্ট্র পবস্পরের নিরাপত্তার জন্য সৈন্য, সরঞ্জাম, সর্ববিধ সুবিধা, সংবাদ ও শ্রম যথাসাধ্য পরস্পরকে যোগাইবে। বলিতে গেলে একই ভাণ্ডারে ইহারা যুদ্ধের জন্য সব কিছু জমা দিবে এবং ওই মিলিত ভাণ্ডার হইতেই সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজনমত সকল রণক্ষেত্রে সরবরাহ হইতে থাকিবে। যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া যাইবে তখন যে সব অস্ত্রশস্ত্র ও সরঞ্জাম রক্ষা পাইবে বা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা আমেরিকাকে ফেরত দিতে হইবে (কারণ আমেরিকাই এখন পর্যন্ত ইংলণ্ডকে দিয়া চলিয়াছে; নিজে এখনও কিছু গ্রহণ করে নাই, প্রয়োজনও নাই)—যদি প্রেসিডেন্ট মনে করেন, ওই সব জিনিস নিজ দেশরক্ষার জন্য বা অন্য কারণে আবশ্যক হইবে। ইহার পরে যাহা থাকিবে, তৎসম্পর্কে বিচার করিবার সময় ইংলণ্ড ১৯৪১, ১১ই মার্চ তারিখের পর এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যাহা করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করা হইবে। ইংলণ্ডকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যাইতে হইবে এবং ইহা লেণ্ড-লিজ সাহায্যের হিসাব-নিকাশকালে প্রতিদানস্বরূপ গ্রহণ করা হইবে।

---

(১) নামটি প্রণিধানযোগ্য। ইহা কি জগতের 'মাষ্টারি' বা গুরুগিরির ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব-সূচনা ?

এই "মাস্টার এগ্রিমেণ্টে"র সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিধানটি ৭নং ধারায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা এইরূপ—যুদ্ধ-সমাপ্তির পর আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে হিসাবনিকাশের সময়ে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে উভয়ের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কোনরূপ বিরোধের সৃষ্টি হইতে না পারে এবং অর্থনৈতিক সম্বন্ধ, পরস্পরের পক্ষে সুবিধাজনক এবং অপরের পক্ষেও উন্নতিমূলক, হইতে পারে। উভয়ে একযোগে এই উদ্দেশ্য লইয়া কার্য করিবেন এবং এই একই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া যদি অন্য কোন জাতি তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতে চাহেন, তবে তাঁহাদের জন্যও দ্বার উন্মুক্ত রাখা হইবে। উভয়ের চরম লক্ষ্য হইবে—জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নূতন নূতন কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া উৎপাদন ও কর্মক্ষেত্রের প্রসার সাধন করা এবং পণ্যবিনিময়ের সুযোগ ও ভোগের উন্নতিবিধান করা —যাহার উপর [illegible]খিল মানবের স্বাধীনতা ও আর্থিক কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। এতদ্ব্যতীত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্র হইতে সর্বপ্রকার পক্ষপাতমূলক আচরণ বিদূরিত করা এবং শুল্ক-প্রাচীর ও অন্যান্য প্রতিবন্ধের প্রতিকার করাও ইহাদের অন্যতম লক্ষ্য হইবে। সর্বোপরি, ১৯৪১, ১২ই আগস্ট তারিখে বিঘোষিত আটলাণ্টিক চার্টারও (সর্বজনীন স্বাধীনতা সনদ) (১) এই মাস্টার-এগ্রিমেণ্টেরই অন্তর্গত। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ইহাও বলিয়া রাখিয়াছেন যে, যদি কোন দেশ এই যুদ্ধের দরুণ তাহার জাতীয় আয়ের (ন্যাশনাল ইন্‌কাম-এর) শতকরা এমন একটা অংশ ব্যয় করে, যাহা অপর দেশের জাতীয় আয়ের (শতকরা অংশের) সমতুল্য, তাহা হইলে সেই দেশকে লেণ্ড-লিজ হিসাবে ঋণী সাব্যস্ত করা হইবে না।

---

(১) "সর্বজনীন" বা "নিখিল মানব" বলিতে এসিয়া বা আফ্রিকাবাসীকে বুঝাইবে না—চার্চিল-টীকা।

বিশ্লেষণ করিলে ঋণ ও ইজারা বন্দোবস্তের শেষ কথা ইহাই দাঁড়ায় যে, প্রেসিডেণ্ট সাহেব সাহায্যপ্রাপ্ত মিত্রশক্তির নিকট কোন প্রতিদানই চাহেন না, শুধু চাহেন, তাহারা ট্যাঙ্ক, প্লেন, মেশিনগান, যন্ত্রপাতি কোন কিছুর ভাবনা না ভাবিয়া প্রাণপণ কেবল লড়াই করিয়া যাইবে এবং যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত গুড কন্‌ডাক্ট-এর প্রমাণ দিতে পারিবে, তাহা দিতে পারিলেই, ঋণ ও ইজারার সকল দায় হইতে তাহারা মুক্ত। রকমসকম দেখিয়া মনে হয়, বৃদ্ধ পিতামহ ঠাকুর যেন পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া যুদ্ধক্রীড়ারত বালকদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিতেছেন, "হাত ঘুরালে নাড়ু দেব, নইলে নাড়ু কোথায় পাব।"

যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন মিত্র শক্তিকে ১৯৪৩, জানুয়ারী মাস পর্যন্ত যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সাহায্য সরবরাহ খাতে (ফর গুড্‌স্ অ্যাণ্ড সারভিসেস) কি পরিমাণ ঋণ ও ইজারারূপ নাড়ু দিয়াছেন, তাহার একটি হিসাব এখানে দিতেছি : গ্রেটবৃটেন—১১১ কোটি স্টার্লিং, রুশিয়া—[illegible] কোটি স্টার্লিং, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা—৪০ কোটি স্টার্লিং, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, চীন ও ভারতবর্ষ—৩৪ কোটি স্টার্লিং, অন্যান্য এলাকা—১১½ কোটি স্টার্লিং। মোট ২৪২½ কোটি স্টার্লিং অর্থাৎ ৩২২৫ কোটি টাকা ! (১)

এই বিরাট দানসত্র খুলিবার কারণ কি শুধুই বিশ্ব-পরিত্রাণ-যজ্ঞের নিষ্কাম পৌরোহিত্যের গৌরব-লাভ ? শুধুই উৎপীড়িত, অত্যাচারিত মানব-জাতির মুক্তি-অর্জন ? হে বিশ্বত্রাতা, সত্যই কি তোমার কল্যাণে

> "দুঃসহ ব্যথা হবে অবসান, জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ,
> পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে।
> এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে" ?

---

(১) তন্মধ্যে আমাদের অংশে ঋণ-ইজারার নাড়ু লাভ হইয়াছে (১৯৪৩, ১লা মার্চ নাগাদ) ৫৯½ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৩৪ কোটি টাকা মূল্যের।

পরোপকারের নাম করিয়া আত্মোপকার সাধন করাই যুগধর্ম। তুমি দেখিতেছি, আত্মোপকারের নাম করিয়া ("টু প্রোমোট দি ডিফেন্স অব ইউ. এস. এ." দ্রষ্টব্য) পরোপকার ব্রত আরম্ভ করিলে! এইরূপ অভিনব আচরণেরই বা কারণ কি? মুখেও পরোপকার, কাজেও পরোপকার যদি করিতে, তাহা হইলে ক্ষতি কি ছিল? উহাতে সত্য ও আদর্শ দুইই রক্ষা হইত না কি? অধুনা সকলেই অত্যন্ত সতর্ক ও সেয়ানা হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই কি পরোপকার-ব্রত উদ্‌যাপনের পথ সহজ ও সুগম করিবার জন্য নিজের মস্তকে এই কলঙ্কপশরা তুলিয়া লইলে?

তোমার শত্রুরা বলিতেছে, সর্বগ্রাসী যুদ্ধের সর্বগ্রাসী দেনা কেহ শোধ করিতে পারে না, ইহা তুমি গতবারে দেখিয়াছ। নগদ মূল্য দিয়া এই অনির্বাণ চিতার কাঠও কেহ খরিদ করিতে পারিবে না, ইহাও তুমি ভাল করিয়া জান। তাই নাকি এবার তুমি তোমার মিত্রগণকে ধারে মাল বিক্রয় কর নাই, নগদ টাকা ধার দাও নাই, নিঃস্বত্ব হইয়া কিছু দানও কর নাই। অথচ এই তিনেরই অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়া, ঋণ ও ইজারা এই দুইটি সমাসবদ্ধ পদের সাহায্যে এমন একটি অদ্ভুত রসায়ন সৃষ্টি করিয়াছ যাহার গূঢ় অর্থ আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার লাঠিও ভাঙিবে না, সাপও মরিবে এবং জগতে শ্যাম খুড়োর একাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই কি তোমার উদ্দেশ্য? এই ব্যবস্থায় পৃথকভাবে ধার, বিক্রয়, দান কিছুই নাই সত্য; কিন্তু একাধারে সবই আছে এবং যাহার যাহা প্রয়োজন, তাহা পাইবার সুন্দর সুবন্দোবস্তও আছে! শুধু বলিতে হইবে—গুরুদেব, তোমার পতাকা মোরে দাও, আর তাহা বহিবারে দাও শকতি, তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভকতি। অমনই গুরুদেবের দেশ হইতে সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ সব হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িতে থাকিবে। এবারে আর মাল লইয়া বা টাকা

লইয়া সটকান দেওয়া চলিবে না, কারণ গুরুভাইরা এবার আমাদের ঘরের মধ্যেই অতিথি—যাকে বলা যাইতে পারে মর্গেজি-ইন্-পজেসন। আমাদের হাট-ঘাট, বাজার-বন্দর সবই আজ তাঁহার জিম্মায়, আমাদের ঘরের হাড়ির খবর সব কিছু তাঁহাদের নখদর্পণে। একবার যখন লেণ্ড-লিজ রসায়ন গলাধঃকরণ করিয়া গুরুভাই বলিয়া গৃহে আহ্বান করিয়াছি, তখন আমাদিগকে শেষ পর্যন্ত অতিথি-সৎকার করিতেই হইবে। ইংরেজ প্রভুর অনুগ্রহে বিশ্ব-গুরুর কৃপালাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। এবার এই মন্বন্তরের ধাক্কায় সবংশে যদি মরিও, তথাপি এই বিশ্বাস লইয়া শান্তিতে যাইতে পারিব যে, দেশের কুপুত্র আমরা মরিয়া বাঁচিয়াছি, কিন্তু গুরুর কৃপায় স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি আমাদের, শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া গেল!

গত যুদ্ধের হিসাব নিকাশ

বিগত মহাসমরের হিসাব নিকাশটা ভাল করিয়া জানা থাকিলে বর্তমান মহাসমরের ভবিষ্যৎ হিসাবের বহর সম্বন্ধে ধারণা করা আমাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ সহজসাধ্য হইতে পারে। সেই কারণে বর্তমান সময়ে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না; বরং অতীতের, এমন কি বর্তমানের এই অভূতপূর্ব ব্যাপার সম্বন্ধে আমাদের যে বিরাট অজ্ঞতা রহিয়াছে তাহার খানিকটা নিরাকরণ হইতে পারে।

বিগত লড়াই ও রুশিয়ার বিপ্লবের পরে আমেরিকান সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তরে লেনিন বলেন: "বিজ্ঞান ও কলকব্জার অভাবনীয় উন্নতি, বিশেষতঃ যাতায়াত ও সংবাদ আদান-প্রদানের কল্পনাতীত প্রসার, বিশালাকৃতি ব্যাঙ্ক ও বিরাট মূলধনের জন্য—ধনতন্ত্রবাদকে অত্যধিক পরিপক্ক করিয়া তুলিয়াছে এবং তার প্রয়োজনকে আজ নিঃশেষিত করিয়া দিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নতির সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সর্বশক্তিমান মুষ্টিমেয় কয়েকটি লক্ষপতি ও কোটিপতির হাতের পুতুল হইয়া ইহা আজ বিভিন্ন জাতিকে যুদ্ধের নামে নরহত্যায় প্ররোচিত করিতেছে—পৃথিবীর দুর্বল জাতি ও দেশসমূহের উপর' ইঙ্গ-ফরাসী কিম্বা জার্মান দস্যু অধিকার ও কর্তৃত্ব লাভ করিবে, এই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিবার জন্য। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের সময় এই দুনিয়ার ভাগাভাগির জন্যই লক্ষ লক্ষ লোককে প্রাণ হারাইতে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে আহত ও বিকলাঙ্গ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই সত্য আজ প্রত্যেক দেশের শ্রমিক জনসাধারণের মধ্যে আস্তে আস্তে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

যে সব দেশ বিগত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল তাহাদের জনসাধারণের মধ্যেও এই সত্য আজ আর গোপন নাই। কারণ মহাযুদ্ধের ফলে বিজয়ী এবং বিজিত প্রত্যেক দেশেই অভূতপূর্ব ধনক্ষয় ও প্রাণনাশ ঘটিয়াছিল এবং যুদ্ধের পরেও বিজয়ী দেশগুলির অধিবাসিগণকে বিরাট সমর-ঋণের সুদ বহন করিতে হইতেছে।

"ধনতন্ত্রের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, সর্বসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী মনোবৃত্তি দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তার নিদর্শন চারিদিক হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ধনিকেরা কতকগুলি দেশে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাবকে আরো অসংখ্য কৃষক ও শ্রমিকের বিনাশ সাধন করিয়া কিছুকাল ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু ধনতন্ত্রবাদকে তাঁহারা শেষ পর্যন্ত কিছুতেই বাঁচাইতে পারিবেন না।"

বিগত ১৯১৪-১৮ সালের লড়াই দুনিয়াকে নূতন ভাবে ভাগ করিয়া ভোগ করিবার জন্য সঙ্ঘটিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, এবং এই লড়াই ধনতন্ত্রের ভিতকে অনেকখানি শিথিল করিয়া দিয়া গিয়াছে তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই লড়াইয়ে সকল পক্ষে সর্বসমেত মোট ছয় কোটী বিশ লক্ষ সৈনিক নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এক কোটী লোক প্রাণ হারাইয়াছিল এবং দুই কোটী চল্লিশ লক্ষ লোক চিরজীবনের মত বিকলাঙ্গ হইয়াছিল। হিসাব করিয়া অনুমান করা হয় যে, এই লড়াইয়ে মোট তিন সহস্র বিলিয়ন ডলার ব্যয় হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে যুধ্যমান দেশ-সমূহের মোট সম্পদের মূল্য ছিল ছয় সহস্র বিলিয়ন ডলার। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বহু শতাব্দী আপ্রাণ পরিশ্রম করিয়া ইয়োরোপের কৃষক ও শ্রমিক যে বিরাট ধনসম্পদ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহার অর্ধেকই গোলাবারুদের গ্যাস ও ধোঁয়ার মধ্য দিয়া তাহাদেরই হত্যায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক আর্থিক কাঠামো এমন গুরুতররূপে জখম হইয়াছিল যে সে আঘাত হইতে সে শেষ পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই। যে মনুষ্যশ্রেণী ধনোৎপাদন করিয়া থাকে তাহার একটা বিরাট অংশ নিজ নিজ উৎপাদনের কাজ ছাড়িয়া দিয়া লড়াইয়ের কাজে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কোন কোন দেশের কৃষক ও শ্রমিকের এক-তৃতীয়াংশই সৈনিক-বৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। ইহাদের মধ্যে সমাজের বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ যুবকের সংখ্যাই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। তাহাদের স্থানে অক্ষম, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোকদের দেশের ধনোৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা হয়।

অন্য দিকে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার ফলে বহু দেশের বহু ধনসম্পদ-পরিপূর্ণ অংশগুলি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। এই ধ্বংসের আক্রমণ হইতে কৃষি বা শিল্পপ্রধান কেন্দ্র কিছুই রেহাই পায় নাই। উত্তর ফ্রান্সে এক একটি বড় বড় নগর বড বড় অগ্নিবর্ষী কামানের গোলা বর্ষণে একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছিল। মহামূল্য খনিজ সম্পদও এভাবে সম্পূর্ণ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

সর্বোপরি প্রত্যেক দেশে পণ্যসম্পদ উৎপাদনের ব্যবস্থা যুদ্ধের প্রয়োজনে একেবারে ওলটপালট হইয়া যায়। মানুষের ভোগ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামগ্রী উৎপাদন অপেক্ষা মানুষ-ধ্বংসের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনই তখন অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। যুদ্ধের প্রারম্ভে যুযুধান দেশসমূহের বাৎসরিক আয় ছিল মোট ৮৫,০০০,০০০,০০০ ডলার। কর্মঠ কৃষক ও শ্রমিকগণের যুদ্ধে যোগদান করার ফলে এই সব দেশের বাৎসরিক আয় অনুমান এক-তৃতীয়াংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহা হইলে যুদ্ধের সময় এই সব দেশের মোট আয় দাঁড়াইয়াছিল মোটামুটি ৫৭,০০০,০০০,০০০ ডলার। (১) বেসামরিক উদ্দেশ্যে বাৎসরিক ব্যয়

(১) ডলার ২৸০ আনার সমান।

যদি শতকরা ৫৫ ভাগ ধরা যায়, তাহা হইলে এই সব দেশের বাৎসরিক আয় হইতে যুদ্ধের জন্য ২৫,০০০,০০০,০০০ ডলার মাত্র পাওয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের চারি বৎসরে তাহা হইলে পাওয়া গিয়াছিল মোট ১০০,০০০,০০০,০০০ ডলার। অথচ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে চারি বৎসরে যুদ্ধে মোট ব্যয় হইয়াছিল ৩০০,০০০,০০০,০০০ ডলার। সুতরাং অবশিষ্ট ঘাটতি ২০০,০০০,০০০,০০০ ডলার দেশের মূলধন ভাঙ্গিয়া সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল এবং এই অনুপাতে ইয়োরোপ যুদ্ধের পর দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল। এইতো গেল আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ।

কিন্তু ধনোৎপাদনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ জনবলের কি ক্ষতি হইয়াছিল তাহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য। ১৯১৩ সালে ইয়োরোপের মোট জনসংখ্যা ছিল চল্লিশ কোটী দশ লক্ষ। কোন লড়াই না বাধিলে স্বাভাবিক গতিতে ১৯১৯ সালে জনসংখ্যা ৪২,৫০,০০,০০০ বিয়াল্লিশ কোটী পঞ্চাশ লক্ষে দাঁড়াইত, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ মোট জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৩৮,৯০,০০,০০০ মাত্র। অর্থাৎ ইয়োরোপ মোটের উপর তিন কোটী ষাট্ লক্ষ লোক এই যুদ্ধের দরুণ হারাইয়াছিল—মোট জনসংখ্যার শতকরা নয় ভাগ। ইহাদের সকলেই লড়াইতে প্রাণ হারায় নাই; মহামারীতেও অনেকের প্রাণনাশ ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ পুরুষ যুদ্ধে চলিয়া যাওয়ায় জন্মের হার হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের পর আর্থিক অবস্থা হীন হওয়ায় মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তদুপরি আমরা যদি স্মরণ করি যে, যাহারা ধনোৎপাদনে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ, কর্মঠ ও কুশলী ছিল তাহাদের সহায়তা হইতে দেশগুলি বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা হইলে ধনোৎপাদনে পৃথিবীর ক্ষতির পরিমাণ কতটা গুরুতর হইয়াছিল তাহা সহজেই আমাদের উপলব্ধি হইবে। এই যুদ্ধে একদিকে যেমন অসংখ্য শ্রমিক ও কৃষক সামরিক পোষাকে সজ্জিত

হইয়া শত্রুর কামানের খোরাকরূপে অসহ্য দুঃখকষ্ট অথবা ধ্রুব মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছিল, অন্যদিকে যাহারা পশ্চাতে ছিল তাহাদিগকে স্বল্পাহারে অল্প বেতনে দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত কলকারখানায় কিংবা উন্মুক্ত পথে-প্রান্তরে, যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও রাস্তা-ঘাট প্রস্তুত করিবার জন্য প্রাণপণ খাটিতে হইতেছিল। তাহাতেও রক্ষা ছিল না। যুদ্ধের সময়কার নিষ্ঠুর, সামরিক একনায়কত্বের দোর্দণ্ড প্রতাপে নিজেদের সুখদুঃখ অভাব-অভিযোগ লইয়া বিন্দুমাত্র অসন্তোষ বা আপত্তি প্রদর্শন করিবার উপায় ছিল না; করিলেই রুদ্র রাজরোষ তাহাদের উপর অব্যর্থ সন্ধানে বর্ষিত হইতেছিল। একদিকে লড়াইয়ের অমানুষিক ভীষণতা ও বীভৎসতা, অন্যদিকে গৃহে কঠিন নিয়ন্ত্রণের মাঝে দিনরাত্রি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। ধনতন্ত্রবাদের বৈষম্য ও অসঙ্গতি বিগত লড়াইয়ের অবস্থার ভিতর দিয়াও অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং ধনিক ও দরিদ্রের পার্থক্যকে আরও সুস্পষ্টরূপে উৎঘাটিত করিয়া দিয়াছিল। যুদ্ধের কুফল হইতে পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীও রেহাই পায় নাই।

বিগত লড়াই, যেমন বর্তমান লড়াই, ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক ও অনিবার্য ফল। এই লড়াই হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল যে ধনতন্ত্রবাদ মানবসমাজের পক্ষে অচল হইয়া উঠিয়াছে। এই ধনতন্ত্রের ভিতরে ভবিষ্যৎ মানবসমাজের ধ্বংসের বীজ যে প্রবেশ করিয়াছে তাহা এই যুদ্ধের পরে আরো সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই ফলে রুশিয়ায় অক্টোবর মাসের বিপ্লবের আবির্ভাব এবং পৃথিবীর এক-ষষ্ঠমাংশে সমাজতন্ত্র নামে এক নূতন বিধানের পত্তন। ইয়োরোপে ধনতন্ত্রবাদের একাধিপত্য এভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার ফলেই বর্তমান সময়ে এই দুইটি বিরুদ্ধ আদর্শের সংঘর্ষ আত্মগোপন করিয়া অন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বাহিরে আমরা যেরূপ যোগাযোগই দেখি

না কেন, একদিকে রহিয়াছে পুরাতন ধনতন্ত্রবাদ, অন্যদিকে কৃষক ও শ্রমিকের নূতন সমাজতন্ত্রবাদ এবং সোভিয়েট রুশিয়াই অদ্যাবধি এই নূতন বিধানের একমাত্র জন্ম ও বাসস্থান। বর্তমান যুগকে আমরা একদিক দিয়া বিচার করিয়া ধনতন্ত্রের ক্ষয় ও বিনাশের যুগ এবং অন্যদিক দিয়া সমাজতন্ত্রের নব অভ্যুদয়ের যুগ হিসাবে গণ্য করিতে পারি। যদিও পৃথিবীর এক-ষষ্ঠমাংশ সোভিয়েট রুশিয়া ভিন্ন অন্যত্র ধনতন্ত্রের প্রাধান্য আজও বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি ধনতন্ত্রবাদী দেশসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ ও ধ্বংসের বীজ যে পাকাপাকিরূপে নিহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা বর্তমান ইয়োরোপীয় যুদ্ধ হইতে আরো পরিষ্কার হইয়া গেল। এই যুদ্ধ পর্যন্ত আসিবারও প্রয়োজন হয় না। বিগত যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থা আলোচনা করিলেও তাহা আমাদের নিকট যথেষ্ট সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইবে।

গত যুদ্ধ সমস্ত যুধ্যমান দেশের আর্থিক কাঠামোকে কি রকম দুর্বল করিয়া দিয়া গিয়াছিল তাহা দেখাইবার জন্য বিশেষ প্রমাণের আবশ্যক হয় না। বিজয়ী দেশসমূহ অবশ্য যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ের বোঝা বিজিত দেশগুলির উপর পরিচালনা করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক এবং বুলগেরিয়ার অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহাদের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভবপর হয় নাই। বিজিত দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র জার্মানীর নিকট হইতেই যাহা কিছু ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারা গিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা লইয়াই গত যুদ্ধের সূচনা এবং এই যুদ্ধেরও আরম্ভ। জার্মানীকে সকল রকমে ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই গত যুদ্ধের 'ভারসাই' সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় এবং ফলে জার্মানীকে সর্ববিষয়ে হীনতা ও দীনতা বরণ করিয়া লইতে

হয়। কয়লা ও লৌহসম্পদসম্পন্ন কতকগুলি প্রদেশকে জার্মানীর অঙ্গচ্ছেদ করিয়া ছিনাইয়া লইয়া ফ্রান্সকে দেওয়া হয়। তার পণ্যবাহী নৌবহরকেও মিত্রশক্তির হস্তে সমর্পণ করা হয়; উপনিবেশ ও অন্যান্য রাজ্য হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করা হয়। সর্বোপরি যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণের জন্য তাহার উপর ১৩২,০০০,০০০,০০০ গোল্ড মার্ক জরিমানাস্বরূপ ধার্য করা হয়! একদিকে সাম্রাজ্য ও ধনতন্ত্রবাদী জার্মানী এবং তাহার সহযোগী দেশসমূহের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে; অন্যদিকে বিজয়ী দেশসমূহের মধ্যেও পারস্পরিক সম্বন্ধের অনেকটা অদল-বদল হয়। সর্বাপেক্ষা বেশী লাভবান হয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। লড়াইয়ে তাহাকে নামমাত্র অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু মিত্রশক্তিকে দীর্ঘ চারি বৎসরব্যাপী লড়াইয়ের সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করিয়া সে লাভবান হইয়াছিল কল্পনাতীত। এক কথায় বলিতে গেলে এই যুদ্ধের পরেই বৃটিশ বিভবের গৌরব-রবি অস্ত গিয়া উদয় হইয়াছিল যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার গগনে। বিশ্বের হাটে ইংলণ্ডের যে একাধিপত্য ছিল সে স্থান তার তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা গত লড়াইয়ের সুযোগে দখল করিয়া বসিয়াছিল। লড়াইয়ের পূর্বে আমেরিকার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইংলণ্ড ও জার্মানী। এই দুই দেশ যখন পরস্পরের গলা কাটিতে নিযুক্ত তখন আমেরিকা সেই সুযোগে নিজের সুবিধাটুকু বেশ ভাল করিয়া আদায় করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিল।

বিগত লড়াইয়ে আমেরিকা কতটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল তাহার একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব এখানে দেওয়া যাইতেছে। যুধ্যমান দেশগুলি যখন যুদ্ধের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কয়লা, লোহা, ইস্পাত, গম, তৈল, কাপড় প্রভৃতি পণ্যের অফুরন্ত দাবী মিটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না, তখন এইসব জিনিস

সরবরাহ করিবার চাহিদা আমেরিকার উপর আসিয়া পড়ে। অন্যদিকে কৃষিপ্রধান দক্ষিণ আমেরিকা ও এশিয়া যুদ্ধের দরুণ ইউরোপ হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় পাকামাল আমদানী করিতে অসমর্থ হওয়ায় সে অভাব পূরণ করিবার ভারও পড়িল আমেরিকার উপর। যুদ্ধের পূর্বে কিন্তু ইংলণ্ড, জার্মানী এবং অপরাপর দেশই এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার এই সব অভাব মিটাইত; কিন্তু যুদ্ধের সময় তাহাদের পক্ষে এই সব মাল সরবরাহ বা রপ্তানী করা অসম্ভব হওয়ায় আমেরিকায় কৃষি ও শিল্পের অভূতপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হইল এবং আমেরিকা সহজেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ হইয়া দাঁড়াইল এবং ধনতন্ত্রবাদের ভারকেন্দ্রও ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় স্থানান্তরিত হইল।

গত যুদ্ধের পূর্বে শিল্পক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের খুব একটা বড় স্থান ছিল না। ১৯০৫ সালে আমেরিকা যে কৃষিজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানী করে তার মূল্য ছিল ১,০০০,০০০,০০০ ডলার এবং শিল্পজাত পণ্য রপ্তানীর মূল্য ছিল ৪৬০,০০০,০০০ ডলার মাত্র। কিন্তু যুদ্ধের সময় আমেরিকার শিল্পোন্নতি অভাবনীয় তৎপরতার সহিত সাধিত হইয়াছিল। ১৯১৪ সালে আমেরিকার উৎপন্ন শিল্পজাত পণ্যের মোট মূল্য ছিল ২৪,২৪৬,০০০,০০০ ডলার। ১০১৮ সালে উহার মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ৬২,৫৮০,০০০,০০০ ডলার! যুদ্ধের সময় আমেরিকায় কাপড় ও ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িয়া গিয়াছিল শতকরা ৪০ ভাগ, কয়লা ও তামার শতকরা ২০ ভাগ, জিঙ্কের শতকরা ৮০ ভাগ, তৈলের শতকরা ৪৫ ভাগ! সমুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যা এই সময়ে দশগুণ বাড়িয়াছিল; মোটর গাড়ীর সংখ্যা বাড়িয়াছিল দ্বিগুণ। ১৯১৯ সালে আমেরিকা যে পাকামাল বিদেশে রপ্তানী করিয়াছিল তাহার মোট মূল্য ছিল ২,০৭২,০০০,০০০ ডলার। সেই বৎসর কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের

রপ্তানী হইয়াছিল মাত্র ১,৪০৮,০০০,০০০ ডলার।* সুতরাং উল্লিখিত হিসাব হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে আমেরিকা যুদ্ধের পূর্বে কৃষিপ্রধান দেশ ছিল সেই আমেরিকা যুদ্ধের চারি বৎসরের মধ্যে শিল্পসম্পদে তাহার কৃষি-সম্পদকে পশ্চাতে ফেলিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, যদিও কৃষি-সম্পদও যুদ্ধের সুযোগে পূর্বের তুলনায় আরো অনেকটা উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৯১৩-১৮ সালের মধ্যে আমেরিকার কৃষিজাত উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং গো-মহিষাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল আরো বেশী।

যুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড ছিল পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ এবং সকলের নেতৃস্থানীয়। ইংলণ্ডের মূলধন পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই খাটিতেছিল, আমেরিকাও বাদ যায় নাই। সুতরাং সকলেই ছিল ইংলণ্ডের দেনাদার। ইংলণ্ডের কারেন্সী 'স্টার্লিং' পৃথিবীর আর সব অর্থের তুলনায় সর্বাপেক্ষা অধিক স্থিতিবান ও নির্ভরযোগ্য গণ্য হইত। স্টার্লিঙের কখনো মূল্য হ্রাস হইতে পারে একথা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। কিন্তু যুদ্ধের পরে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ইংলণ্ডের বিপুল ধনের একটা বিরাট অংশ যুদ্ধে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; এবং যুদ্ধেরই ফলে নূতন ধনী আমেরিকার কাছে ইংলণ্ডকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে ও দেনাদার হইতে হয়।

১৯১৪-২০ সালের মধ্যে আমেরিকার মোট রপ্তানির মূল্য তার মোট আমদানির মূল্য অপেক্ষা ১৮,০০০,০০০,০০০ ডলার বেশী দাঁড়াইয়াছিল! তাহা হইলে এই বিরাট মূল্যের টাকাটা যে-সব দেশ আমেরিকা হইতে পণ্য আমদানী করিয়াছিল তাহাদিগকে নগদ (in cash) পরিশোধ করিতে হইয়াছে। কি উপায়ে আমেরিকার এই দেনা পরিশোধ করা হইয়াছিল তাহাই এখন পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। প্রথমতঃ, আমেরিকায় ইউরোপীয় বণিকদের যে-সব

ব্যবসা ও কারখানা ছিল সেগুলির স্বত্বাধিকার আমেরিকার অনুকূলে তাহাদের পরিত্যাগ করিতে হয়। এই ভাবে ৩৫,০০০,০০০,০০০ ডলার মূল্যের সম্পত্তি আমেরিকার হস্তগত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যুধ্যমান ইউরোপীয় দেশসমূহের, বিশেষভাবে ইংলণ্ডের, স্বর্ণতহবিলের অধিকাংশ আমেরিকার হাতে তুলিয়া দিতে হয়। ফলে সমগ্র পৃথিবীর মোট স্বর্ণের অর্দ্ধেকের বেশী আমেরিকায় আসিয়া জড় হয়। আমেরিকার নিকট মিত্রশক্তির মিলিত দেনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,০০৭,০০০,০০০ ডলার !! আবার মিত্রশক্তির নিকট ক্ষতিপূরণ স্বরূপ জার্মানীর দেনা স্থির হয় ১৩২,০০০,০০০,০০০ মার্ক্‌স্ (১)। Dawes Plan অনুযায়ী ১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত জার্মানীকে প্রতি বৎসর ২৫,০০০,০০০,০০০ ডলার মিত্রশক্তিবর্গকে দিতে হইবে নির্দিষ্ট হয়। ১৯২৯ সালে Young Plan এই ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া স্থির করে যে, জার্মানীকে ৫৯ বৎসর কাল গড়ে বাৎসরিক ১,৯০০,০০০,০০০ ডলার দিলেই চলিবে! এই প্ল্যান এক বৎসর দশমাস মাত্র চলিবার পরেই ১৯৩২ সালের ১লা জুলাই তারিখে 'হুভার মোরেটোরিয়াম' (দেনা-বিরতি) আমলে আসে এবং এক বৎসরকাল যুদ্ধের দেনা ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার হাত হইতে সকল দেশই রক্ষা পায়। ইতিমধ্যে জার্মানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ যে অর্থ নগদ দিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহার পরিমাণ হইবে ৬৪৫,০০০,০০০ স্টার্লিং। (২) যুদ্ধের এই বিরাট দেনা ও ক্ষতিপূরণের লম্বা বহর দেখিয়া আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি, ইহার ফলে ধনতন্ত্রবাদী বিভিন্ন দেশের আর্থিক অবস্থা যেমন একদিকে এই অসহ্য গুরুভারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে দেনাদার-পাওনাদার, বিজেতা-বিজিতদের মধ্যে রাজনৈতিক

(১) ১ মার্ক প্রায় ৮০। ৮/০ আনার সমান।
(২) ১ স্টার্লিং ১৩।/৩ পাইর সমান।

সম্পর্ক নিশ্চয়ই সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল না। একদিকে মিত্রশক্তি জার্মানীর কাছে তাহাদের 'পাউণ্ড অব্ ফ্লেশ' দাবী করিতেছিল, অন্যদিকে মিত্রশক্তিবর্গের নিজেদের মধ্যেও দেনাপাওনা লইয়া কলহ চলিতেছিল; সর্বোপরি সার্বভৌম উত্তমর্ণ আমেরিকার চাপে সকল অধমর্ণগণই হিম্‌সিম্ খাইতেছিল! জার্মানীর নিকট মিত্রশক্তির প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ, কিংবা মিত্রশক্তির নিজেদের মধ্যে দেনাপাওনা সম্পর্কে, আমেরিকা উদার তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু নিজের পাওনা সম্পর্কে তাহার তাগিদের অন্ত ছিলনা। এরূপ অবস্থায় দুনিয়ার শাসন ও আর্থিক-যন্ত্র যে প্রায় বিকল হইয়া দাঁড়াইবে এবং মানবসমাজে মহা অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।

পৃথিবীর এই দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের জন্য গত মহাযুদ্ধ ও তাহার সন্ধি-সর্তগুলিকে শুধু দায়ী করিলেই চলিবে না—প্রকৃত দায়ী হইতেছে বর্তমান রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রভুত্ব। পুঁজিবাদেরই কুপুত্র হইল সাম্রাজ্যবাদ, এবং এই সাম্রাজ্যবাদই পিতৃ-অপচয়ের এবং শেষ পর্যন্ত তাহার ধ্বংসের কারণ হইবে। অবশ্য এখন পর্যন্ত তাহা হয় নাই; কিন্তু এই যে দ্বিতীয় ইয়োরোপীয় কুরুক্ষেত্রে একই ধর্মাবলম্বী পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদীর মধ্যে লড়াই, ইহা কি তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে না? রুশিয়ার বিরুদ্ধে দুনিয়ার সকল ধনী ও সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থরক্ষা করিতে যাইয়া জার্মানী নিজে নিঃশেষিত হইতেছে, আর ধনী ও সাম্রাজ্যবাদীরাই রুশিয়াকে নিজ হাতে তাহাদের ও তাহাদের স্বধর্মাবলম্বীর মারণ-অস্ত্র যোগাইতেছে! ইহা অপেক্ষা বড় রহস্য এবং ধনবাদের আসন্ন ধ্বংসের বড় লক্ষণ আর কি হইতে পারে?

জার্মান মার্কের মহাপ্রস্থান

এদেশে ইন্‌ফ্লেশনের বর্তমান মরসুমে গত যুদ্ধের ইনফ্লেশন-গুরু জার্মানী ও তাহার মুদ্রা মার্কের তৎকালীন ও তৎপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি। কারণ অধুনা যে মুহূর্মুহু বিশ্বব্যাপী সমরাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে তাহার জন্য শুধু জলস্থলের স্বত্ব-দখল লইয়া রেষারেষি ও ভাগাভাগিই দায়ী নহে, মুদ্রার প্রধান বাহন স্বর্ণের দায়িত্বও ইহার জন্য কম নহে। মুদ্রা-জগতে স্বর্ণের একাধিপত্য কত কর্মঠ ও বলিষ্ঠ জাতির অগ্রগতিকে কি-ভাবে প্রতিহত করিতেছে তদ্বিষয়ে আমাদের ধারণা মোটেই স্পষ্ট নহে। এক দিকে স্বর্ণে ভাগ বসাইবার জন্য মুদ্রানীতির নানারকম মারপ্যাঁচ চলিয়াছে, অন্য দিকে স্বর্ণকে একেবারে বর্জন করিবার চেষ্টা ভাগ্যহীন একদল যথাসাধ্য করিতেছে। তাহারই ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিগুলির মধ্যে বিদ্বেষ-বিষ উদ্‌গীরণ ও সংঘর্ষ আসন্ন হইতেছে। জার্মানীর বর্তমান আত্মবিস্তারের মত্ত প্রচেষ্টার মূলেও তাহাই প্রধানতঃ কার্য করিতেছে।

গত লড়াইয়ের পূর্বে জার্মান মুদ্রা মার্কের মূল্য ছিল আমাদের টাকার মাপে ৸৵০ আনা; বিলাতী মুদ্রা পাউণ্ড-স্টার্লিংএর মাপে এক শিলিং। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের পর মার্কের মূল্য স্বর্ণ বা ধাতুশূন্য হইয়া এমন অভাবনীয় ও বিস্ময়কররূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে সুরু করিল যে ১৲ টাকায় বহু লক্ষ মার্ক কিনিতে পারা যাইত। অর্থাৎ মার্কের তখন আর কোন মূল্যই মুদ্রা জগতে প্রায় ছিল না। জার্মানীতে তখন

লোকেরা ১ লক্ষ মার্ক দিয়া ১ পেয়ালা চা পান করিত! ইহা একটা ঠাট্টার বা তামাসার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—অবশ্য জার্মানবাসীদের নিকট নয়, বিদেশীদের নিকট। বিদেশীদের অনেকেও জার্মান মার্ক লইয়া ফাটকা খেলিতে যাইয়া অনেক টাকা লোকসান দিয়াছিলেন, আবার কেহ দু'দিনের জন্য বাদশাহী ভোগের অধিকারীও হইয়াছিলেন। মার্কের দাম যখন পড়তির মুখে তখন অনেকেই রাতারাতি বড়লোক হইবার লোভে ২০০।১,০০ টাকা, কিংবা সেই পরিমাণ ডলার বা স্টার্লিং-এর বিনিময়ে ২ লক্ষ, ১০ লক্ষ, ২০ লক্ষ মার্কের মালিক হইতেছিলেন এবং আমাদের মত অনেক গরীব লোকেও তখন ২।৪ দিনের জন্য লক্ষপতি (মার্কের হিসাবে) হইবার সুযোগ ও গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। কেহই তখন কল্পনা করিতে পারে নাই যে মার্কের একেবারে শেষ অবস্থা, সকলেই ভাবিতেছিলেন, আমিই সর্বাপেক্ষা সস্তায় আজ মার্ক কিনিয়াছি, কাল হইতে মার্কের দর আস্তে আস্তে চড়িবে। তারপর, পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া না আসিলেও তার কাছাকাছি যখন আসিবে, তখন আমাদের লক্ষ লক্ষ মার্ক মুদ্রাকে টাকা, ডলার, স্টার্লিং বা অন্য কোন মুদ্রায় পুনরায় পরিবর্তিত করিয়া লইব এবং নিজের দেশে লক্ষপতি হইয়া বসিব। কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য! দিনের পর দিন মার্কের দর পড়িতেই থাকিল, আর পূর্বের ক্ষতি খানিকটা পোষাইয়া লইয়া পড়তাটা একটু ভাল করিবার দুরাশায় অনেকেই good money দিয়া আরো মার্ক কিনিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের সে দুরাশা আর পূর্ণ হইল না। অবশেষে এমন একদিন উপস্থিত হইল যেদিন জার্মান সরকার ঘোষণা করিয়া দিলেন, তাহাদের মার্ক মুদ্রা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। অর্থাৎ এই মুদ্রার অস্তিত্বকে জার্মানী আর স্বীকার করিবে না, সুতরাং ইহার দাবী আর তাহারা মিটাইতে পারিবে না। The old mark is dead. এই সময়ে মার্কের এমন

দুরবস্থা হইয়াছিল যে, ১ পাউণ্ড বা ১০।১৫ টাকার বিনিময়ে বিশ কোটী মার্ক কিনিতে পারা যাইত! সুতরাং গঙ্গাযাত্রা বা আত্মহত্যা ছাড়া তাহার আর কোনো উপায়ান্তর ছিল না। যাহারা ২০০।৪০০ টাকা খরচ করিয়া লক্ষ লক্ষ জার্মান মার্কের অধিপতি হইয়াছিলেন তাহারা যদি কাগজের নোটগুলিও হাতের কাছে পাইতেন তাহা হইলে সেগুলিও ওজন দরে বিক্রয় করিয়া খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহারও উপায় ছিল না; কারণ তখন জার্মানীতে একলক্ষ মার্ক অপেক্ষা কম মূল্যের নোটই ছাপা হইত না! যাঁহারা সেই সময়ে তাড়াতাড়ি জার্মানী হইতে পণ্য খরিদ করিতে পারিয়াছিলেন তাহারা খুব লাভবান হইয়াছিলেন। আর লাভবান হইয়াছিলেন তাঁহারা যাঁহারা তখন বিদেশ হইতে জার্মানীতে যাইয়া বসবাস করিয়াছিলেন। অনেক ভারতীয় যুবক সেই সময়ে ২০০।৪০০ টাকায় লক্ষ লক্ষ মার্ক ক্রয় করিয়া জার্মানীতে শিক্ষা লাভের বা ভ্রমণের জন্য চলিয়া গিয়াছিলেন এবং মাসিক ৫।৭ টাকা মাত্র ব্যয় করিয়া সেখানকার সকল রকম খরচ বহন করিয়া শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। যাঁহারা একবারে সমস্ত টাকা দিয়া মার্ক না কিনিয়া বিলাতের ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিয়া যখন যেমন মার্কের দর পড়িতেছিল, নিজ প্রয়োজন মত তখন তেমন ২।১ পাউণ্ড মূল্যের মার্ক কিনিয়াছিলেন তাঁহারা আরো বেশী লাভবান হইয়াছিলেন। জার্মান-প্রবাসী ভারতীয়দের মিলন-স্থল,—"হিন্দুস্থান এসোসিয়েশ্যান" সেই সময়ে দেড় লক্ষ মার্ক মূল্য দিয়া বার্লিনে প্রাসাদোপম একটি গৃহ ক্রয় করিয়াছিলেন—যা' তাঁহারা কখনো কল্পনাও করিতে পারিতেন না। প্রকৃত পক্ষে এর জন্য বোধ হয় ৫।১০ পাউণ্ড কিংবা ১০০।১৫০ টাকার বেশী তাঁহাদের প্রয়োজন হয় নাই! বলা বাহুল্য, এ সময়ে এই ভাবে 'সস্তায়' কেনা সব সম্পত্তি জার্মান সরকার পরে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

এই সময়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার বিশ্বভারতীর কি গুরুতর ক্ষতি হইয়াছিল তাহা কবিগুরুর নিজ ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি— "জার্মানীতে আমার বই বিক্রি সুরু হয়েছিল প্রবল বেগে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। অবশেষে যখন হিসাব মেটাবার সময় এল তখন মার্কের এমন অধঃপতন হোলো, যে তাকে টাকায় পরিণত করতে গেলে এক আঁজলাও ভরে না। সমস্ত আয় জার্মানীকেই দান করে এলুম। তার মূল্য যদি হ্রাস না হোতো তা' হলে বিশ্ব-ভারতীর জন্যে আজ আমাকে ভিক্ষের ঝুলি বয়ে বেড়াতে হোতো না।" (১) ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, যাহারা পাউণ্ড, ডলার, ফ্র্যাঙ্ক, টাকা প্রভৃতি বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে মার্ক ক্রয় করিয়া জার্মানীতে বসিয়া তাহা ব্যয় করিয়াছিলেন কিংবা জার্মান পণ্য ক্রয় করিয়াছিলেন তাঁহারা হইয়াছিলেন অত্যন্ত লাভবান, আর যাঁহারা মার্কের হিসাবে পণ্য বিক্রয় করিয়া সেই মার্ককে টাকা বা অন্য মুদ্রায় পরিণত করিয়া তাহা নিজ দেশে আনিতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের ভাগ্যে লক্ষ মার্কের বিনিময়ে এক আঁজলাও জোটে নাই।

ইহাই পৃথিবীর ইতিহাসে inflation of currency-র চরম দৃষ্টান্ত। পণ্যের মূল্য স্থির রাখিবার জন্য বিক্রয়যোগ্য মোট পণ্যের অনুপাতে মুদ্রার পরিমাণ স্থির রাখিতে হয়, তাহা না করিয়া যদি কোনো দেশের কর্তৃপক্ষ অভাবে পড়িয়া কিংবা খামখেয়ালী ও অজ্ঞতাবশতঃ মুদ্রার পরিমাণ অকারণে বৃদ্ধি করেন বা হ্রাস করেন তাহা হইলে পণ্যের মূল্য যথাক্রমে বাড়িবে ও কমিবে, প্রকারান্তরে মুদ্রামূল্য কমিবে ও বাড়িবে, ইহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। গত লড়াইয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইয়োরোপ ও আমেরিকার মুদ্রা স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাহার অর্থ হইতেছে এই যে, কাজের সুবিধার

(১) রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী।

জন্য কাগজী নোট, চেক, হুণ্ডি যাহাই বাজারে দেনা পাওনা মিটাইবার জন্য চলুক না কেন, সকলের পশ্চাতে ছিল স্বর্ণ, কারণ পাওনাদার বা বেচনদার চেক বা নোট ইত্যাদির বিনিময়ে স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা চাহিলে তাহার সে দাবী কর্তৃপক্ষকে পূরণ করিতে হইবে। অর্থাৎ, সমস্ত বেচাকেনার মূল বাহন, সমস্ত দেনা-পাওনা মিটাইবার আসল বা বড় দালাল হইল স্বর্ণ। অনেক সময় তিনি অন্তরালে অবস্থান করিয়া তাঁহার উপ-দালালদের সাহায্যে কর্ম সম্পাদন করিয়া নেন মাত্র। কাজেই এই স্বর্ণ দিবার দায়িত্ব যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ইচ্ছামত নোট প্রচলন করিয়া টাকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া গবর্মেণ্ট নিজের বা দেশের টাকার অভাব পূরণ করিতে সাহসী হন না। একটা সুনির্দিষ্ট সীমা রক্ষা করিয়া তাহাকে নোট ছাপাইতে হয় এবং প্রয়োজন মত দাবী মিটাইবার জন্য স্বর্ণ তহবিল মজুত রাখিতে হয়। এই স্বর্ণমান প্রথার একটা বড় সুবিধা এই যে, কোনো গবর্মেণ্ট তাহার অমিত-ব্যয়িতা বা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য নোট প্রচলন দ্বারা অযথা অর্থ সম্প্রসারণ (inflation) করিয়া পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটাইয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের বা সর্বসাধারণের অসুবিধা বা ক্ষতি সাধন করিতে অনেকটা বাধা প্রাপ্ত হয়। গত লড়াইয়ের সময় যখন যুধ্যমান দেশ-সমূহের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত হইল এবং অর্থের প্রয়োজনের আর কোনো সীমা-পরিসীমা রহিল না, তখন সকল নীতির সাথে অর্থশাস্ত্রের সুপ্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমান' নীতিটিও পরিত্যক্ত হয়। কারণ তখন যেন-তেন প্রকারেণ অর্থ সৃষ্টির প্রয়োজন। বিদেশের দেনা স্বর্ণে মিটাইতেই হইবে, বিদেশীরা যুদ্ধের সময় অন্য দেশের কাগজী নোট নিতে অস্বীকার করিবে ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু 'পেট্রিয়টিজমের' দোহাই দিয়া, দেশের লোকের দ্বারা তখন সবই করান সম্ভব। তাই গত যুদ্ধের সময় সকল দেশে inflation-এর অল্পবিস্তর অবাধলীলা

চলিয়াছিল। সেই সময়েই এই দেশে আমরা ১০০টাকার কাগজের নোটের ছড়াছড়ি সর্বপ্রথম দেখিতে পাই এবং নোটের বিনিময়ে টাকা চাহিলেই পাওয়া যায় এই নীতির ব্যতিক্রমও তখনই ঘটে। এবারকার মত সেবারও—যদিও সংখ্যায় ও পরিমাণে সম্ভবতঃ এতটা নয়—যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র সরবরাহের সুযোগে কল্পনাতীত ভেজাল ও জুয়াচুরি চালাইয়া বহুলোক রাতারাতি ফাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন এবং খেতাব ও উপাধিভূষিত হইয়া কেউ-কেটা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সস্তা টাকা কিছু হাতে পাইয়া বাংলাদেশেও বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালীর অর্থে ও উদ্যোগে মাথা জাগাইয়া উঠিয়াছিল, আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ জলবুদ্বুদের মত কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় সবগুলিই মিলাইয়াও গিয়াছিল। এই সস্তা টাকার দরুণ পণ্যমূল্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তাহার ফলে নির্দিষ্ট বেতনের চাকুরীজীবী ও দরিদ্র সাধারণের অভাব-অভিযোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল—যদিও শ্রাদ্ধ এবারকার মত এতদূর গড়ায় নাই।

সেবার কাগজের নোট ছাপাইয়া অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি ভিন্ন সমর-ঋণের হুল্লোড় পড়িয়া গিয়াছিল। ৩॥০, ৪৲, ৪॥০, ৫৲, ৫॥০, ৬৲ পার্সেণ্ট পর্যন্ত সুদে গবর্মেণ্ট পর পর টাকা ধার করিয়া চলিয়াছিলেন, যাহার ফলে কম সুদের কোম্পানী কাগজের মূল্য ভয়াবহ রকমে হ্রাস পাইয়া ইহাদের ধনী মালিকদের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল। এইরূপ অভূতপূর্ব উচ্চ সুদে গবর্মেণ্ট পূর্বে আর কখনো টাকা ধার করেন নাই। এবারকার লড়াইয়ে সরকারী ঋণের সুদ আদৌ বৃদ্ধি করা হয় নাই—এবার ইনফ্লেশনের উপরই পূর্ণমাত্রায় জোর দেওয়া হইয়াছে। দেশে কাগজ চালাইয়া পার পাইলেও এবং যুদ্ধে বিজয়মাল্য লাভ করিলেও বিদেশীর দেনা স্বর্ণে মিটাইতে গিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ইংলণ্ডের স্বর্ণ-তহবিল পর্যন্ত গত যুদ্ধের পর হালকা হইয়া

গিয়াছিল। আর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সকলের নিকট চোরের দায়ে ধরা পড়িয়া সকলের জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের দাবী মাথায় করিয়া জার্মানীর কি দশা হইল তাহার পরিচয় ত পূর্বেই খানিকটা দিয়াছি। স্বর্ণ বলিতে তাহার আর কিছু ছিল না। অন্য দেশের সঙ্গে তাহার তফাৎ এই দাঁড়াইয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের অর্থের সম্প্রসারণ একটা সীমার মধ্যে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কাগজী নোট প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা স্বর্ণও ধার করিতেছিলেন এবং ধারও পাইতেছিলেন। কিন্তু ৫ বৎসরকাল একা সকলের সাথে লড়িতে গিয়া চারিদিকে আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইয়া ভারসাই সন্ধির চরম শাস্তির বোঝা মাথায় করিয়া জার্মানীকে সম্পূর্ণ দেউলে হইতে হইয়াছিল। তাহার মুদ্রা স্ফীত হইতে হইতে শেষ পর্যন্ত একেবারে ফাটিয়া পড়িল। পৃথিবীর মুদ্রা ইতিহাসে এই রকম দৃষ্টান্ত আর দ্বিতীয় নাই; এই জন্যই ইহাকে ইন্‌ফ্লেশনের ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টান্ত বলিয়া আমি অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।

যে স্বর্ণমানকে ভিত্তি করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এরূপ প্রসার ও দেনা-পাওনা মিটাইবার এরূপ সুবিধা লাভ হইয়াছিল তাহাকে যদি বহাল রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক দেশে তাহার প্রয়োজনানুযায়ী স্বর্ণ-তহবিল থাকা দরকার। যে দেশ যত বেশী পণ্যসম্পদ বেচে বা কেনে তাহার তত বেশী স্বর্ণের প্রয়োজন। আমরা সম্পদ সৃষ্টি করিবার বুদ্ধি ও শক্তি রাখি এবং আমাদের সম্পদের বিনিময়ে অপরের সম্পদ গ্রহণ করিতে চাই: কিন্তু সম্পদ বিনিময়ের সুবিধার জন্য যে স্বর্ণরূপী দালালটিকে আমরা একদিন সৃষ্টি করিয়াছিলাম তাহার অভাবে আমাদের বিরাট শক্তি ও আয়োজন পণ্ড হইবে ইহা কেমন কথা? বিভিন্ন দেশের মধ্যে mal-distribution of gold বা স্বর্ণের এরূপ অসমঞ্জস বণ্টনের ফলেই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।

এই অবস্থার প্রতিকার তিন উপায়ে হইতে পারে। প্রথম, দেশের আভ্যন্তরীণ দেনা-পাওনা মিটাইবার ব্যাপারে মুদ্রাজগৎ হইতে স্বর্ণের প্রতিপত্তি অপসৃত করিয়া কাগজী নোটকেই অর্থরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া—তাহাকে উপদালালের পদ হইতে প্রধান দালালের অর্থাৎ স্বর্ণের পদে প্রমোশন দেওয়া এবং এই নোট, লোভের বশবর্তী হইয়া অত্যধিক পরিমাণে সৃষ্টি না করিয়া, দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ও কেনা-বেচার প্রয়োজনানুযায়ী সৃষ্টি করা। আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য যথাসাধ্য পণ্য-বিনিময়ের সাহায্যে পরিচালনা করা।

দ্বিতীয়—স্বর্ণকে একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া উহার ব্যবহার আরও হ্রাস করিয়া দিয়া পণ্য-বিনিময়ের দ্বারা কিংবা কাগজী নোটের সাহায্যে কার্য পরিচালনা করা।

তৃতীয়—সোস্যালিজম। বিপাকে পড়িয়া প্রথম পথে চলিয়াছে জার্মানী ও তাহার সহচর ইয়োরোপীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র দেশ, যাহাদের স্বর্ণ-তহবিল অতি যৎসামান্য। দ্বিতীয় পথে, ইংলণ্ড ও তাহার সঙ্গে অনিচ্ছার সহিত আমেরিকা।(১) তৃতীয় পথ রুশিয়ার।

প্রথম ও দ্বিতীয় পন্থার মধ্যে পার্থক্য যদিও বাহ্যতঃ অনেকটা মাত্রার (ডিগ্রির), শ্রেণীর নহে, কিন্তু ভিতরের পার্থক্য আরো একটু গুরুতর। একজন স্বর্ণ-লাভ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া এই পথ ধরিয়াছেন, অন্য জন স্বর্ণের আশা বা লোভ পরিত্যাগ না করিয়া বর্তমান অবস্থায়

(১) অনিচ্ছার সহিত, কারণ স্বর্ণের সম্রাটই আমেরিকা। তাহার ঐ পথে যাইবার কোন দরকার ছিল না, কিন্তু ইংলণ্ডকে হাতে রাখিবার জন্য তাহাকে ঐ পথে খানিকটা যাইতে হইতেছে। এতদ্ভিন্ন, স্বর্ণের উপর পূর্বের মত নির্ভর করিলে তাহার একার সুবিধা হইবে সত্য, কিন্তু দুনিয়ার আর সব স্বর্ণহীন দেশের অবস্থা কি হইবে? আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য যে আবার অচল হইবার আশঙ্কা; পুনরায় যুদ্ধের সম্ভাবনাকেও যে তাহা দ্বারা আগাইয়া আনা হইবে।

ধার্মিকের ভেক ধারণ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষ তাই পণ্য-বিনিময়ের উপরই জোর দিয়াছেন বেশী এবং ইয়োরোপে স্বর্ণবিহীন এক নব-বিধান প্রতিষ্ঠার আশাবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। অন্য পক্ষ স্বর্ণের ব্যবহার হ্রাস করিবার উপর অধিক জোর দিয়াছেন, অন্যথা আমেরিকার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাই বলিয়া এখনো স্বর্ণবিহীন অস্পৃশ্যদের 'শ্রেণীতে (Scheduled caste-এ') নামিতেও রাজি নহেন।' তৃতীয় পক্ষ রুশিয়ার সম্বন্ধে এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন করা যাক্। যুদ্ধের অস্বাভাবিক তাড়নায় পড়িয়া যে স্বর্ণমানকে সকলে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন, যুদ্ধের পরে ১৯১৯ ও ১৯২৫ সালের মধ্যে তাঁহারা সকলেই (রুশিয়া ব্যতীত) একে একে স্বর্ণমানে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার ফলে সমস্ত কাগজী মুদ্রা ও অতিরিক্ত অর্থকে বাতিল করিয়া দিতে হইল এবং অকস্মাৎ একদিন যুদ্ধের কল্যাণে অর্থের বাজারে যে জোয়ার দেখা দিয়াছিল, ভাটার টানে সেখানে নিদারুণ নগ্নমূর্তি দেখা দিল। অর্থাৎ যেখানে ছিল inflation সেখানে উপস্থিত হইল deflation (অর্থ-সঙ্কোচন)। তাহা না করিয়া উপায় ছিল না; কারণ ধন-তন্ত্রবাদের চিরপরিচিত পন্থায় স্বর্ণের মধ্যস্থতা ভিন্ন পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করার অন্য কোন উপায় তাঁহারা ভাবিতে পারেন না; অন্ততঃ তখন পর্যন্ত ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু গত যুদ্ধে যাঁহারা মারাত্মকভাবে জখম হইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে স্বর্ণমানও অন্যতম। কারণ mal-distribution of gold-এর জন্য, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা মূলতঃ দায়ী হইলেও ইহার তীব্রতার জন্য গত লড়াই এবং ভারসাই সন্ধিই প্রধানতঃ দায়ী। তাই প্রধান প্রধান দেশগুলির সমবেত চেষ্টায় ইয়োরোপে পুনরায় স্বর্ণ-

মানের প্রতিষ্ঠা হইলেও, সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে ইংলণ্ডকেই বিশ্বজোড়া ব্যবসা-মন্দার বিপাকে পড়িয়া ১৯৩১ সালে আবার স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিতে হয়। এবং মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা—এই নীতি অনুসরণ করেন (ফ্রান্স, ইটালী এবং ছোট কয়েকটি মধ্য-ইউরোপীয় দেশ ব্যতীত) পৃথিবীর আর সবাই।

ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশের স্বর্ণমান ত্যাগের সহিত রুশিয়া বা জার্মানীর অবস্থার তখন কোনো তুলনাই চলিতে পারে না। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিহার করিয়াছিল পূর্ব হইতে অনেকটা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে; তাহার উদ্দেশ্য ছিল নিজের দেশের মধ্যে স্বর্ণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া স্বর্ণের অপচয় বা হস্তান্তর যথাসম্ভব বারণ করা। আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, স্বর্ণভ্রষ্ট মুদ্রার মূল্য হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিদেশী পণ্যের আমদানি হ্রাস ও দেশী পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া বাণিজ্য-প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা এবং বিদেশ হইতে স্বর্ণ আহরণ করা। কাজেই দেখা যাইতেছে ইহারা বাহ্যতঃ স্বর্ণ পরিত্যাগ করিলেও অন্তরে করেন নাই। নিজের দেশের বা সাম্রাজ্যের মধ্যে নোটের বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দিবার আইনসঙ্গত দায়িত্ব হইতেই শুধু ইহারা নিজেদেব মুক্ত করিয়া নিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণের ব্যবহার নিজেদের নিয়ন্ত্রিত গণ্ডির মধ্যে বন্ধ করেন নাই। বরঞ্চ স্বর্ণের প্রতি অতিলোভ ও তাঁহার উপর অধিকতর নির্ভরশীলতার জন্যই বিদেশ হইতে স্বর্ণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এখানে জার্মানী ও রুশিয়ার এই সময়কার অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করা যাক। ১৯২৪ সালে জার্মানীর মার্কমুদ্রা স্ফীত হইতে হইতে যখন একেবারে ফাটিয়া পড়িল, তখন জার্মানী ১৯২৫ সালে 'রেন্টিন মার্ক' নামে নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ দুনিয়ার দরবারে একান্ত

মূল্যহীন ও অপদার্থ পুরাতন মার্ককে বাতিল ও অচল করিয়া দিয়া হালখাতায় নূতন মার্ক দিয়া নূতন হিসাব খোলে। একেবারে স্বর্ণ-বিহীন কাগজের মার্ক দিয়া কাজ চালান তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না—অন্ততঃ তখন পর্যন্ত। কারণ তখন লড়াইয়ের পর সব দেশই পুনরায় স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পপ্রধান, বহির্বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল, ইজ্জত-বিহীন জার্মানীকে বিদেশীরা স্বর্ণ ছাড়া মাল বেচিবে না। তৃতীয়তঃ, দেশের লোকের মনে খানিকটা আশা ও আস্থা আনিতে হইলে, তাহাদের সম্মুখে তাহাদের অত্যন্ত চিরপরিচিত স্বর্ণমুদ্রা পুনরায় উপস্থিত করা প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, বিদেশের নিকট যুদ্ধের বিরাট দেনা ও দণ্ডের টাকা স্বর্ণ দিয়া দিতে হইবে—তাহারা জার্মানীর পণ্যের বিনিময়ে তাহাকে ঋণমুক্ত করিতে প্রস্তুত নয়। তাই জার্মানী তার দেশের রেলওয়ে বাঁধা দিয়া আমেরিকা হইতে স্বর্ণ ধার করিয়া ১৯২৫ সালে নূতন করিয়া এই স্বর্ণ-মার্কের সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়। ইংলণ্ডও সেই সময়ে তাহাকে শতকরা ৮৲ টাকা সুদে বহু অর্থ ধার দিয়াছিল, যাহাতে রুশিয়ার 'বলশেভিজম' ও ফ্রান্সের বর্ধিত শক্তির বিপক্ষে প্রয়োজন হইলে একটা তৃতীয় পক্ষকে দাঁড় করান যায়। এত উচ্চ সুদে টাকা ধার করিয়া দেশের কৃষি ও শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও উন্নতিসাধন জার্মানীর মত কর্মকুশল জাতির পক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক হয় নাই এবং তাহাকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত নানা প্রকার দুর্যোগ ও অন্তর্বিপ্লবের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়াই চলিতে হয়। সেই সময়ে ইংলণ্ড যখন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে তখন অন্যান্য দেশের সহিত জার্মানীও সেই পথ অবলম্বন করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। পূর্বেই বলিয়াছি, স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার অর্থ স্বর্ণকে একেবারে পরিত্যাগ করা নয়—প্রত্যেককে নোটের বিনিময়ে স্বদেশে স্বর্ণ দিবার আইনসঙ্গত দায়িত্ব হইতে শুধু

মুক্তি লাভ করা। যাহা হউক, শান্তির সময়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী ও সম্পদশালী ইংলণ্ডের পক্ষে স্বর্ণমান পরিত্যাগ এবং অন্যান্য দেশ কর্তৃক তাহার পদাঙ্কানুসরণ স্বর্ণমানের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ও স্মরণীয় ঘটনা—যাহা ধনতান্ত্রিক যন্ত্র ও তাহার বাহন স্বর্ণের ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের পরিষ্কার সূচনা করে।

এই সময়েই জার্মানীতে হিট্‌লারের আবির্ভাব ও ক্ষমতালাভের সূত্রপাত। অবস্থার দায়ে জার্মানীকে মুদ্রার জন্য স্বর্ণের আধিপত্য বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইলেও রুশিয়াকে তাহা করিতে হয় নাই। কারণ রুশিয়ার ১৯১৯ সালের ঐতিহাসিক বিপ্লবের মূল নীতিই ছিল অর্থ বা স্বর্ণ-বিরোধী। মুদ্রার সাহায্যে পণ্য-বিনিময়ের পরিবর্তে দেশের প্রত্যেক অধিবাসী রাষ্ট্রের অধীনে কাজ করিয়া পণ্য উৎপাদন করিবে এবং নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী উৎপন্ন পণ্য ভোগ করিবার অধিকারী হইবে, এই ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী লেনিন ও তাঁহার সহকর্মীদের উদ্দেশ্য। কাগজের নোট সেখানে নামেমাত্র রাখা হইয়াছিল আয়-ব্যয়ের হিসাব ও পণ্যের মূল্য নিরূপণের শুধু একটা মাপকাঠি হিসাবে। রুশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ ও সর্ববিধ নৈসর্গিক সম্পদের অধিকারী হওয়ায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইয়াছিল। কারণ বহির্বাণিজ্যে শিল্পজাত পণ্য বিক্রয় যতটা কঠিন, কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় ততটা কঠিন নয়। বিদেশ হইতে তাহাকে যে সব কলকব্জা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য আমদানী করিতে হইত, তাহার মূল্য সে স্বর্ণ দ্বারা না দিয়া কৃষিজাত পণ্য দ্বারা পরিশোধ করিত। তার দেশের লোককে মজুরিস্বরূপ অর্থ দিয়া পণ্য উৎপাদন করিতে হয় নাই বলিয়া সে অন্য দেশের তুলনায় সহজেই তার কৃষি-সম্পদ বিদেশে সস্তায় বিক্রি করিতে পারিত। তাই অর্থ বা স্বর্ণকে একেবারে বাদ

দিয়া যে ব্যবস্থা চালান রুশিয়ার পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল জার্মানীর পক্ষে ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা সম্ভবপব ছিল না। তা'ছাড়া, যদিও হিটলার পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করার পর দেশের অনেক বড বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনিয়াছিলেন, তথাপি দেশ হইতে রুশিয়ার মত ব্যক্তিগত ধনাধিকার বা শিল্প-প্রচেষ্টার বিলোপ সাধন করা নিশ্চয়ই তাঁহাব উদ্দেশ্য ছিল না। এই অবস্থাটাকে একটা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে মাঝামাঝি সাময়িক রফা বলা যাইতে পারে। একদিকে হিটলার দেশের ক্রমবর্ধমান ও শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করিলেও, কম্যুনিজমের নীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করেন নাই। অন্যদিকে আবার দেশের পুঁজিবাদী ও শিল্পপতিদের সকলকে খারিজ করিয়া দিয়া তাঁহাদেরও চটান নাই। তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশের ধনিক ও শ্রমিক উভয় শ্রেণীকেই হাতে রাখিয়া জার্মান জাতির বিশেষ কৌলীন্য বা আভিজাত্যের দোহাই দিয়া দেশের চরম দুরবস্থার মোড ঘুরাইযা দিতে। তাই সর্বসাধারণের নিকট জিনিসটাকে লোভনীয় করিয়া তুলিবার জন্য এই নীতির নাম দিযাছিলেন জাতীয সমাজতন্ত্রবাদ (National Socialism)

Race superiorityর মারাত্মক অহমিকাকে বাদ দিলে রুশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দেখা যায় অনেক বেশী। যেটুকু বৈষম্য ছিল তার মূলে ছিল ভৌগোলিক কারণ। বিশালকায়, প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিপতি রুশিয়ার পক্ষে অন্য দেশের সহিত বিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধ ও আত্ম-সর্বস্ব হইয়া নিজের ঘর সামলানো ও জগতের মুক্তির কথা ভাবা যতটা সহজসাধ্য ছিল, এই সব অনুকূল অবস্থার অভাবে জার্মানীর পক্ষে তা' একেবারেই সম্ভব ছিল না। বৈদেশিক বাণিজ্য ভিন্ন তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব; অথচ ইহার জন্য তাহার না ছিল ভূমি, না ছিল স্বর্ণ। সমদুঃখী

সমাবস্থাপন্ন কতকগুলি দেশ বা জাতিকে হাত করিতে না পারিলে, পরস্পরের সুবিধামত নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি দ্বারা পণ্য বিনিময়ের সাহায্যে বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো সম্ভব নয়। তাই অ্যাংলো-আমেরিকার বিরুদ্ধে হিটলারের এই ভয়ানক গাত্রদাহ, জার্মানীর এই ভয়ঙ্কর বর্তমান যুদ্ধ অভিযান, এবং পৃথিবীর স্বর্ণহীন বিত্তহীন দেশসমূহের সম্মুখে এই নব-বিধান (new order) প্রতিষ্ঠা সঙ্কল্পের সু-উচ্চ ঘোষণা। কতকগুলি দেশের সঙ্গে পণ্য-বিনিময়ের পারস্পরিক চুক্তির সাহায্যেই স্বর্ণহীন জার্মানী এই নরমেধ যজ্ঞের কল্পনাতীত বিপুল ব্যয়ভার বহন করিয়া চলিয়াছে। সেই জন্যই হিটলার বারবার বড় গলায় বলিতেছে, "Labour is my gold" (কর্মক্ষমতাই আমার স্বর্ণ) "যুদ্ধের ফলাফল আর যাহাই ঘটুক না কেন, দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে স্বর্ণকে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না।" ভবিষ্যতে আভ্যন্তরিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র হইতে স্বর্ণকে বিতাড়িত করিয়া বিভিন্ন দেশের মধ্যে আপোষ চুক্তি দ্বারা পণ্য-বিনিময়ের সাহায্যে কাজকর্ম চালানোই হিটলারের উদ্দেশ্য।

তাঁহার এই অভিলাষ যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পর্বত-প্রমাণ স্বর্ণ(১) সঞ্চয় করিয়া আমেরিকা যে মধুর স্বপ্ন দেখিতেছিল তাহা অনেকখানি ধূলিসাৎ হইবে। তর্কের খাতিরে জার্মানীর জয়লাভ যদি আমরা স্বীকার করিয়াও লই তাহা হইলেও ভূমি ও স্বর্ণ লাভের রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্ত হইবার পর সে যে তার দুর্দিনের সঙ্কল্প ও প্রতিশ্রুতি পালন করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? অন্যদিকে জার্মানীর পরাজয়

(১) ১৯৩৭ সালে পৃথিবীর মোট স্বর্ণ-তহবিলের বিভাগ : যুক্তরাষ্ট্র শতকরা ৪৭ ভাগ, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রত্যেকে ১৪ ভাগ, স্পেইন, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড ও রুশিয়া প্রত্যেকে ৩ ভাগ, জাপান, আর্জেন্টিনা, নেদারল্যাণ্ডস্ প্রত্যেকে ২ ভাগ, আর সব দেশ মিলিয়া মাত্র ১০ ভাগ—তাহার মধ্যে জার্মানী।

ঘটিলেও (যাহা আজ সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে) বর্তমান অ্যাংলো-আমেরিকা-রুশিয়ার মৈত্রীর মধ্যে এই মুদ্রানীতিকে অবলম্বন করিয়াই ভবিষ্যৎ বিচ্ছেদ ও নূতন সঙ্কটের বীজ এই সময়েই রোপিত হইতেছে না তাহাই বা কে জানে ?(২)

এই যুদ্ধ মিত্রশক্তির অনুকূলে নিষ্পত্তি হইলেও সারা ইউরোপে আবার যে অভিশপ্ত হাহাকারের সৃষ্টি হইবে না এবং তাহা হইতে নূতন আগ্নেয়গিরি আবার ধ্বংস ও মৃত্যু উদ্গীরণ করিবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে ? সে সব কথা না হয় থাক। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, জার্মানী কি নূতন পথ অনুসরণ করিয়া ইন্‌ফ্লেশনের পিচ্ছিল পথ পরিহার করিয়া চলিতে সক্ষম হইয়াছে ? না, এবারও পূর্বের মতই কাগজী নোটের পাহাড় সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধের এই বিরাট খরচ বহন করিতেছে ? জার্মানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের এখন জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, তাহার শত্রুপক্ষ যখন মিথ্যা করিয়াও এই অপবাদ তাহাকে এ পর্যন্ত দেয় নাই তখন ইন্‌ফ্লেশনের মারাত্মক আত্মঘাতী পথে এবার সে মহাবিপদে পড়িয়াও পা বাড়ায় নাই। অন্যান্য লক্ষণ হইতেও ইহাই অনুমান হয়। তারপর প্রশ্ন হইবে, তবে কোথা হইতে টাকা আসিতেছে ? টাকাও আসিবার প্রয়োজন নাই, কারণ টাকা ত' লড়াই করে না, লড়াই করে মানুষ ও জিনিস, ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। জিনিসের বিনিময়ে সে হয়ত মানুষ ও জিনিসকে কিনিতেছে। বিনামূল্যে বলপূর্বক মানুষ ও জিনিস সে সংগ্রহ করিতেছে এইরূপ অপবাদ আমরা

(২) প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের দক্ষিণ হস্ত মিঃ হ্যারি হপ্‌কিন্‌স্ তাঁহার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধে সম্প্রতি বলিয়াছেন, "Some people in England are just as afraid of the U. S. A. as some people in the U. S. A. are afraid of Britain." দুই দেশের মধ্যে Unitas plan Vs Bancor plan লইয়া মতবৈধও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহাও স্বর্ণের ভবিষ্যৎ গুরুত্ব লইয়াই মতভেদ।

তাহাকে দিতে পারি। কিন্তু তাহার উত্তরে সে হয়ত বলিবে, ইয়োরোপে তাহার অধিকৃত দেশসমূহে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের কথা তাহার শত্রুও বিশেষ দিতে পারিতেছে না। তা'ছাড়া, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া দিয়া শুধু কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিলেও কোনো দোষ হয় না—যদি বৈদেশিক বাণিজ্য পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা পণ্য-বিনিময়ের সাহায্যে বজায় রাখা যায়। দোষ নোটের নহে; দোষ প্রয়োজনের অতিরিক্ত নোটের, যে নোটের পশ্চাতে যথেষ্ট পণ্যসম্পদ নাই সেই নোটের। সেই নোটই পণ্যের অনুপাতে সংখ্যাধিক্যের জোরে মূল্যকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দরিদ্রকে নিষ্পেষিত করে, সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, এবং তাহাই ইন্‌ফ্লেশন। হিটলার তাহার অপরিসীম শক্তির যতখানি কৃতিত্ব দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহার অনেকখানিই সম্ভব হইয়াছিল অর্থনীতি-ক্ষেত্রে ডক্টর সাখ্‌ট্‌-এর জন্য। তিনিই হিটলারকে অর্থের সকল দুর্ভাবনা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এই নীতি প্রচার ও অনুসরণ করিয়া যে, দেশে যতদিন পর্যন্ত বেকার লোক রহিয়াছে, এবং তাহাদিগকে কর্মে নিয়োজিত করিয়া পণ্যোৎপাদনের ব্যবস্থা করিবার বুদ্ধি রহিয়াছে, ততদিন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ চিত্তে নোট ছাপাইয়া টাকা তৈরি করিয়া অর্থাভাব মোচন করা যাইতে পারে। তাহাতে ইন্‌ফ্লেশন হয় না। কারণ নোটের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইবে, পণ্যও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইবে এবং অর্থ ও পণ্যের মধ্যে সংখ্যার অনুপাত ঠিকই থাকিবে; সুতরাং পণ্যমূল্যও বাড়িতে পারিবে না। অন্য সব দেশেও এই নিয়মেই কাজ চলিতেছে। শুধু তাহাই নহে, এই সর্বগ্রাসী যুদ্ধের বিপাকে পড়িয়া সকল রাষ্ট্রই সোভিয়েট রুশিয়ার অনুকরণে দেশের সমস্ত পণ্যের উপর কর্তৃত্ব ও অধিকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অধিবাসীকে নির্দিষ্ট মূল্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ করিতেছেন। এই খানেই এই দুর্ভাগা দেশের সহিত অন্যান্য দেশের পার্থক্য। অন্যান্য দেশে ইন্‌ফ্লেশনও

নাই এবং যুদ্ধের শুরু হইতে ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সর্বত্র পণ্যের সমভোগ (রেশনিং) নির্ধারিত রহিয়াছে। আর এ দেশে দেখিতে পাইতেছি ইনফ্রেশনের কাঞ্চনজঙ্ঘা, আর এতদিনে শুনিতে পাইতেছি কয়েকটি সহরে-বন্দরে ছিটেফোঁটা রেশনিং-এর কথা—তাহাও অসংখ্য লোক পরলোকযাত্রা করিবার পর এবং আরো অসংখ্য লোক পরলোকযাত্রা করিবার ভয় দেখাইবার ফলে। অন্যান্য দেশ গত যুদ্ধের শিক্ষা কাজে লাগাইয়া বাঁচিবার পথ খুঁজিয়া পাইল, আর এ দেশে আমাদের জন্য ঐ শিক্ষা কাজে লাগাইবার মত প্রবৃত্তি ও শক্তি কাহারো মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। না পাইবারই কথা—ভাগের মার জন্য কাহার আর এত মাথা ব্যথা।

যুদ্ধের পরে—আমরা ও তাহারা

যুদ্ধোত্তর সমস্যা ও পুনর্গঠন সম্বন্ধে চারিদিকে নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিয়াছে বহুদিন হইতে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা নানারূপ পরিকল্পনা ইতিমধ্যে প্রস্তুত করিয়াছেন, এবং তাহা লইয়া গোপন আলোচনা ও বাহিরে তর্ক বিতর্কও বহু হইয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কর ও ইউনিটাস্ প্ল্যানের কথা বৎসরাধিক কাল হইতে আমরা শুনিতে পাইতেছি। মজা হইতেছে এই যে, প্ল্যানের ধারাবিশেষ লইয়া উভয় পক্ষের মতবিরোধ সংক্রান্ত সমালোচনা সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে বটে; কিন্তু আজ পর্যন্ত কোথাও কল্পনা দুইটির পরিপূর্ণ রূপ আমরা দেখিতে পাই নাই। অ্যাংলো-আমেরিকা যুদ্ধের পর সমগ্র দুনিয়াটাকে কি ভাবে পরিচালনা করিবেন, তাহা উঁহাদের তাঁবেদারগণের সমক্ষে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত করিবার পূর্বে তাঁহাদের দুই জনের একমত হওয়া আবশ্যক। সেই চেষ্টাই যবনিকার অন্তরালে চলিয়াছে এবং উভয় পক্ষের এক্স্পার্টদের মধ্যে ঐ উদ্দেশ্যেই মাঝে মাঝে বৈঠক চলিতেছে। যুদ্ধোত্তর দুনিয়া নিয়ন্ত্রণের এই প্ল্যান সম্পর্কে ভারত সরকার নাকি এখনও কোনো মত প্রকাশ করেন নাই; কারণ এই প্ল্যানের কোনো অফিসিয়াল নকল তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই। হস্তগত হইলেই এই প্ল্যানের উপর যে তাঁহারা কোথাও কলম চালাইতে পারিবেন, এমন কি উহার কমা, সেমিকোলন বদলাইবার, কিম্বা "ব"-এর পেট কাটিবার অধিকার লাভ করিবেন সে দুরাশা অবশ্য আমরা করিনা। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা নাই, তার দুনিয়া নিয়ন্ত্রণ! "রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি "খেলা"র ষ্টেজ উত্তীর্ণ হইবার পর আমাদের ভাগ্যে এই ব্যাঙ্কর-ইউনিটাস্ প্ল্যানের মেঘমুক্ত পরিপূর্ণ রূপ

দেখিবার সৌভাগ্য কখন হইবে তাহা জানিনা। কিন্তু একথা ঠিক যে, যুদ্ধে জিতিবার পূর্বেই যুদ্ধোত্তর শান্তিপর্বের পালার রিহার্স্যাল প্রায় সমান তালেই চলিয়াছে। ইহার অবশ্য কারণ আছে। গতবার ইহাদের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, যুদ্ধ জয় করা অপেক্ষা 'শান্তি' জয় করা কম কষ্টসাধ্য নহে। জোট বাঁধিয়া প্ল্যান করিয়া, আন্তর্জাতিক পরিত্রাণের মিশন ব্যতীত নিজ নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থার চিন্তা এবং কাজও এই সব দেশে সুরু হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে জয়লাভ করার পরেও কি ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে তাহা যুদ্ধের সময় ও তৎপরবর্তী কালের দুইটি চিত্রের প্রতি মানসনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

যুদ্ধের সময়কার চিত্রে আমরা কি দেখিতে পাই?—প্রথমতঃ, দেশ দেশান্তর হইতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমর ক্ষেত্রে আবাহন এবং যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, গোলা বারুদ প্রস্তুতের জন্য অসংখ্য লোকের কর্মনিয়োগ। সৈন্য সামন্ত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কুলি মজুর, এক কথায় বলিতে গেলে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রায় কেহই এই নরমেধ যজ্ঞের আমন্ত্রণ হইতে বাদ যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ হইতে সুরু করিয়া সর্বপ্রকার জিনিসের কল্পনাতীত চাহিদা বৃদ্ধি। প্রত্যেক দেশের গবর্মেণ্ট শুধু তৎকালীন প্রয়োজনের জন্য নহে, ভবিষ্যতের আশঙ্কায় অসম্ভব রকম পণ্য প্রস্তুত ও খরিদ করেন।

তৃতীয়তঃ, প্রত্যহ যে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হয় তাহা সঙ্কুলান করিবার জন্য অনেক গবর্মেণ্ট স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া কাগজি মুদ্রা ও ক্রেডিট্ সাহায্যে অর্থের পরিমাণ অসম্ভব রকম বৃদ্ধি করিয়া চলেন। সুতরাং যুদ্ধের সময় কাহারো কর্মাভাব হয় নাই; অর্থাভাব ঘটে নাই; কোনো জিনিস পড়িয়া থাকিতে পায় না।

কিন্তু পরবর্তী চিত্রে আমরা কি দেখিতে পাই? প্রথমতঃ, লক্ষ লক্ষ লোক সমরাঙ্গন হইতে ফিরিয়া আসে,—কেহ সুস্থ শরীরে, কেহ বিকলাঙ্গ হইয়া। কিন্তু তাহাদের কর্ম শেষ হইয়া গিয়াছে। দেশের কর্মক্ষেত্র অপরে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। সে কর্মক্ষেত্রও চাহিদার অভাবে অচল হইবার দাখিল।

দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন শেষ হওয়ায় পণ্যের অভাবনীয় চাহিদা অকস্মাৎ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু পণ্যোৎপাদনের বিরাট ব্যবস্থা মুখব্যাদান করিয়া তেম্নিই দাঁড়াইয়া আছে। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের পর দেশসমূহ আস্তে আস্তে স্বর্ণমানে প্রত্যাবর্তন করিয়া কাগজি মুদ্রা ও ক্রেডিট সঙ্কোচন পূর্বক অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া মানুষের অর্থ কাড়িয়া লইতেছে। সুতরাং দেশে দেশে অসংখ্য লোকের কর্মাভাব ও বেকার সমস্যা; চারিদিকে অর্থাভাব।

তারপর বিজিত দেশসমূহের উপর কোটি কোটি টাকার ঋণভার ও ক্ষতিপূরণের দাবী, বোঝার উপর শাকের আঁটির মত চাপাইয়া দিয়া বিশ্বব্যাপী ব্যবসামন্দাকে ডাকিয়া আনিয়া চিত্রটিকে পূর্ণাঙ্গ করা হয়। এই জন্যই এখন হইতে "শান্তি"র সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য এত তোড়জোড়। ইংলণ্ডের Sir William Beveridge অনেকদিন হইল যুদ্ধোত্তর বেকার ও অভাবের সহিত লড়িবার জন্য মনোনীত কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে "Pillars of Security" (নিরাপত্তার স্তম্ভ) শীর্ষক পুস্তকও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। আমেরিকার যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাও সরকারী কর্মচারীগণ প্রস্তুত করিয়া প্রেসিডেণ্টের নিকট পেশ করিয়া দিয়াছেন। শুধু প্ল্যান করিয়াই ইহারা ক্ষান্ত হন নাই। বহুক্ষেত্রে ঐ প্ল্যান অনুযায়ী কাজও সুরু হইয়া গিয়াছে। "The most significant fact of all is that post-war thinking in U. S. A. has long since moved

from general plan to the level of definite action" কিন্তু যেমন সর্বদা হইয়া থাকে—"ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়"।

কাজের কথা ছাড়িয়াই দিলাম। যে ভারত গবর্ণমেণ্ট কমিটি, সব-কমিটি, কমিশনের এত অনুরক্ত, এবং তৎবিষয়ে মস্ত ওস্তাদ, তাঁহারাও কিন্তু আজ এ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্ল্যান কাগজে পত্রেও খাড়া করিতে পারিলেন না। অবশ্য তাঁহারা এ বিষয়ে কাহারও পশ্চাতে নহেন তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বহু পূর্বে ১৯৪১ সালেই ভারত-সরকার এই সম্পর্কে একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু আঁতুড়েই তাহার মৃত্যু ঘটে। বর্তমান বর্ষে উহাকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টায় কমিটির সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া আবার কতকগুলি হোমরাচোমরা, ধামাধরা নূতন ব্যক্তির নামে চিঠি জারি করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অবশ্য ভারত-গবর্ণমেণ্টকে এজন্য দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ভারতবর্ষের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন তো ইংলণ্ডের পুনর্গঠনেরই নামান্তর বা অপর পিঠ। সুতরাং ইংলণ্ডের পুনর্গঠনের স্কীম তৈরী ও কার্যকরী হইলে ভারতের আর ভাবনা কি? পৃথক স্কীমের দরকার কি? এতদ্ব্যতীত, আমরা যখন যুদ্ধকালে শ্মশান-বিভীষিকার মধ্যেই একপ্রকার শয্যা বিছাইয়াছি তখন যুদ্ধোত্তরকালে obituary tablet বা পুণ্য স্মৃতিস্তম্ভ ভিন্ন আর কি আশা করিতে পারি?

এক্ষণে স্যার উইলিয়াম বেভারিজের প্রস্তুত স্কীম অনুযায়ী বৃটেনবাসীর জন্য যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক।

স্যার উইলিয়াম বেভারিজ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতিরূপে ১৯৪২, ডিসেম্বর মাসে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়া বিশ্বখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর বৃটেনে নিম্নস্তরের অধিবাসীদের আর্থিক ও দৈহিক উন্নতির উপায় নির্ধারণ করাই এই

কমিটির মূল উদ্দেশ্য এবং উহার একটি কার্যকরী পরিকল্পনাই এই রিপোর্টের বিষয়বস্তু। এই কমিটি নিয়োগ ও পরিকল্পনা প্রস্তুতের মূলে একটি গৌণ উদ্দেশ্যও ছিল বলিয়া আমরা মনে করি। আপামর সাধারণকে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ও অপর দেশ আক্রমণ করিবার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করাইতে কিংবা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে তাহাদের সম্মুখে ভবিষ্যৎ জীবনের একটা উজ্জ্বলতর ছবি উপস্থিত করা আবশ্যক। সেইজন্যই এই মহাযুদ্ধের মহাসঙ্কট মুহূর্তে, বৃটেনের অবস্থা যখন টলটলায়মান,—এমন সময়েও উহাদের নেতৃবর্গ শান্তিপর্বের উন্নততর চিত্র অঙ্কন করিবার জন্য সময় ও চিন্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিন্তু সামান্য প্রতিশ্রুতি দাবী করিলেও যুদ্ধের দোহাই দিয়া উহাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়।

এখন পরিকল্পনাটির স্বরূপ সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। ইহার মূল উদ্দেশ্য হইয়াছে,—যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই দেশে এরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে যাহার ফলে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক নরনারী মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার মত একটা আয়ের অধিকারী হইতে পারে। কর্মাভাব কিংবা কর্মশক্তির অভাব কিংবা বৃহৎ পরিবার—এই তিন কারণে অভাবের সৃষ্টি। তাই প্রস্তাব করা হইয়াছে, মানুষের আয়কে একদিকে কর্ম-জীবন ও বেকার-জীবন এবং অপরদিকে বৃহৎ পরিবার ও ক্ষুদ্র পরিবার, এই দুই কাল-পর্যায়ে ভাগ করা হইবে এবং ইহার জন্য একপ্রকার সোস্যাল ইন্‌সিওরেন্স ও শিশু-ভাতার বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে। এই প্ল্যান অনুযায়ী ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকলকে একই হারে ইন্‌সিওরেন্সের চাঁদা দিতে হইবে এবং সকলে তুল্য প্রতিদান পাইবে। মানুষের শ্রেণী-বিভাগ উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র হিসাবে না করিয়া নিম্নলিখিতরূপে করা হইয়াছে:—(১) চাকুরীজীবী বা বেতনভুক্, (২) স্বাধীন ব্যবসায়ী, কর্মী বা মালিক, (৩) কর্মক্ষম ও

বিবাহিত স্ত্রীলোক, (৪) কর্মক্ষম বেকার, (৫) কর্মের বহির্ভূত স্বল্প বয়স্ক বালক-বালিকা, (৬) কর্মের বহির্ভূত অধিক বয়স্ক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা।

প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে প্রতি সপ্তাহে কিংবা মাসে একটি করিয়া নির্দিষ্ট মূল্যের ইন্‌সিওরেন্স ষ্ট্যাম্প তাহাদের বীমাপত্রের উপর আঁটিয়া দিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর বেলায় তাহার মনিবকেও ঐভাবে একটা নির্দিষ্ট মূল্য তাহার ভৃত্যের বীমাপত্রের জন্য দিতে হইবে। নারী অপেক্ষা পুরুষের বীমার চাঁদা কিছু বেশী হইবে; কারণ ঐ অতিরিক্ত চাঁদা হইতে তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নারীদের প্রাপ্যও দেওয়া হইবে। ৫ম শ্রেণী তাহাদের ভাতা এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণী তাহাদের পেন্‌সেন্ সরকার হইতে পাইবে।

এইরূপ বীমা হইতে ১ম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বেকার হইয়া পড়িলে, কিংবা ব্যাধি, দৈব দুর্ঘটনা বা বার্ধক্যের দরুণ কর্মে অক্ষম হইয়া পড়িলে ভাতা ও পেন্‌সন্ পাইবে; অধিকন্তু চিকিৎসার ব্যয় এবং শ্মশান-খরচও পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীও এই সবই পাইবে, পার্থক্য শুধু এই যে, প্রথম ১৩ সপ্তাহকাল তাহাদিগকে বেকার বা অক্ষমতার ভাতা দেওয়া হইবে না। ৪র্থ শ্রেণী বেকার ও অক্ষমতার ভাতা পাইবে না, তদ্বিনিময়ে জীবিকার্জনের সাহায্যার্থ নূতন নূতন শিক্ষার সুযোগ তাহাদের জন্য করিয়া দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন আর সকল সুবিধাই তাহারাও পাইবে। পূর্বোল্লিখিত স্বামীপ্রদত্ত চাঁদার দরুণ ৩য় শ্রেণীর বিবাহিত স্ত্রীলোকগণ মাতৃত্বের, বৈধব্যের, এবং বিচ্ছেদের ভাতা পাইবে; অধিকন্তু কর্মান্তে নির্দিষ্ট বয়সে পেন্‌সনের অধিকারিণী হইবে। এতদ্ভিন্ন সন্তান প্রসবের পূর্বে ও পরে ১৩ সপ্তাহকাল কর্মবিরতির দরুণ আরো একটি 'বেনিফিট' পাইবে।

এই রিপোর্টের নির্দেশানুযায়ী প্রত্যেক বেতনভুক্ পুরুষ ও নারীকে যথাক্রমে সপ্তাহে ৭ শিলিং-৬ পেনি ও ৬ শিলিং বীমার চাঁদা দিতে হইবে।

তন্মধ্যে যথাক্রমে ৩ শিলিং ৩ পেনি ও ২ শিলিং ৬ পেনি মনিবের দেয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (non-adults) ব্যক্তি ও অন্যান্যদের চাঁদার হার অপেক্ষাকৃত কম নির্ধারণ করা হইয়াছে। এইরূপ চাঁদা হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইবে তাহাদ্বারা এই ইনসিওরেন্স স্কিমের দরুণ মোট দেয় টাকার ½ অংশ মাত্র সঙ্কুলান হইবে—অবশিষ্ট ½ অংশ টাকা গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স ধার্য করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন শিশুদের ভাতা ও দেশব্যাপী স্বাস্থ্যোন্নতি ও চিকিৎসার জন্য সরকার হইতে যে ব্যবস্থা করিতে হইবে তাহার সম্পূর্ণ টাকাটাই কর-সাহায্যে তোলা হইবে। যেসব শিল্পকারখানার কাজে শ্রমিকদের বিপদ সম্ভাবনা অধিক, সেই সব কারখানার মালিকদের এইজন্য একটা বিশেষ কর দিতে হইবে।,

বীমার চাঁদার হার আমরা উপরে উল্লেখ করিয়াছি। এখন ইহার বিনিময়ে কোন্ অবস্থায় কি পরিমাণ অর্থ-সাহায্য পাওয়া যাইবে, অতি সংক্ষেপে তাহা উল্লেখ করিতেছি। বেকার অবস্থা বা অক্ষমতার জন্য (in unemployment or disability) প্রত্যেক বিবাহিত ব্যক্তিকে প্রতি সপ্তাহে ৪০ শিলিং দেওয়া হইবে। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের বয়স হইলেও পেন্সন্‌স্বরূপ উহার ৪০ শিলিংই (প্রতি সপ্তাহে) প্রাপ্য হইবে। অবিবাহিত পুরুষ ও নারী এবং বিবাহিত পুরুষ যাহার স্ত্রী কোনরূপ কাজকর্মে নিযুক্ত নহে—প্রত্যেকে সপ্তাহে ২৪ শিলিং করিয়া পাইবে। সন্তান প্রসবের সময় প্রত্যেক নারীকে ৪ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া হইবে। এতদ্ভিন্ন কর্মনিযুক্ত নারীর বেলায় অতিরিক্ত ৩৬ শিলিং দেওয়া হইবে ১৩ সপ্তাহ কাল। বিভিন্ন প্রকার অবস্থায় আরো বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

Social Security Insurance, Children's allowances এবং বিনা মূল্যে Comprehensive Health & Rehabilitation Services-এর দরুণ ১৯৪৫ সনে (যদি এই স্কিম সেই সময়ে প্রবর্তন

করা হয়) ৬৯৭ মিলিয়ন পাউণ্ড ব্যয় হইবে অনুমান করা হইয়াছে। ১৯৬৫ সন নাগাদ এই ব্যয়ের পরিমাণ ৮৫৮ মিলিয়ন পাউণ্ড পর্যন্ত দাঁড়াইবার সম্ভাবনা। এই বাবদ বর্তমানে যে টাকা খরচ হইতেছে তাহা ইহার মধ্যে ধরা হইয়াছে। বর্তমান ব্যয় অপেক্ষা নূতন স্কিম অনুযায়ী ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৪৫ সনে ৮৬ মিলিয়ন এবং ১৯৬৫ সনে ২৫৪ মিলিয়ন পাউণ্ড বেশী পড়িবে।

এই প্ল্যানটির গোড়ায় দুইটি নীতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ, যাহার যেরূপ অবস্থাই হউক না কেন, অর্থাৎ বড় চাকুরিয়াই হউন আর ছোট চাকুরিয়াই হউন, বৃহৎ ব্যবসায়ীই হউন, আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীই হউন, সকলকে একই হারে চাঁদা দিতে হইবে এবং প্রতিদান বা 'বেনিফিট'ও সকলে একই হারে পাইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিপদের বা অভাবের সময়ে সরকারের কৃপাদত্ত 'ডোল' বা ভিক্ষার উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারী নিজেদের প্রদত্ত চাঁদার বিনিময়ে নিজ অধিকারে সরকার হইতে সাহায্য দাবী করিতে পারিবে। বাহ্যতঃ এই স্কিমটিকে সাম্যবাদের ও সমাজতন্ত্রের একটি বড় dose বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে ইহা দ্বারা সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রকে নিজ দেশ হইতে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে উহাদের প্রতি বাহ্যিক সম্মান মাত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে। অবশ্য গরীবের অভাব-অভিযোগ বহু পরিমাণে ইহা দ্বারা বিদূরিত হইবে; ইহার সাফল্যের জন্য ধনীদিগকে বহু টাকা ট্যাক্স বাবদ দিতে হইবে, এই সবই সত্য। কিন্তু ব্যক্তিগত ধনাধিকার যখন পূর্ববৎ সম্পূর্ণই বজায় থাকিবে, কৃষি-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রের অধিগত না হইয়া ব্যক্তির অধিগতই থাকিবে তখন ধন-তান্ত্রিক সমাজের শ্রেণী-বৈষম্য বজায়ই থাকিয়া যাইবে—তবে 'মানুষের' মত নিঃশঙ্ক চিত্তে যাহাতে প্রত্যেক মানুষ—সামান্য কৃষক ও শ্রমিকও—জীবন যাপন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইবে। এই স্কিমের মধ্যে 'বৃটিশ জিনিয়াস'এর পরিচয়

আমরা পূর্ণ মাত্রায় দেখিতে পাই। কোন অবস্থায়ই কোনরূপ ভয়ঙ্কর বিপ্লবের মধ্যে না যাইয়া আস্তে আস্তে সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী কি ভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করিতে হয়, তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত এই চেষ্টার মধ্যে আমরা দেখিতে পাইতেছি। যুদ্ধোত্তর বৃটেনে এই স্কিম প্রবর্তিত হইলে সেখানকার অধস্তন সমাজের অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার নানা সমস্যা যে বহু পরিমাণে সুমীমাংসিত হইয়া যাইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু স্কিম প্রণয়নকর্তা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, এই স্কিম অনুযায়ী কাজ করা ততক্ষণ পর্যন্তই সম্ভবপর যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে বেকার-সমস্যা প্রবল বা ব্যাপক আকার ধারণ না করে। কারণ ব্যাপক আকারে বেকার-সমস্যা উপস্থিত হইবার অর্থ ই হইল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সাধারণ মন্দার আবির্ভাব। সেই অবস্থায় এই পরিকল্পনার বৃহৎ ব্যয়-ভার গবর্মেণ্টের পক্ষে বহন করা কঠিন হইবে এবং ধনীদের দিক হইতেও ইহার জন্য অতিরিক্ত ট্যাক্স দেওয়ার প্রতিবাদ প্রবলতর হইবে। এইখানেই গোলমাল। আমাদের গুরুতর আশঙ্কা হইতেছে—এই কারণেই। এই স্কিমকে সফল করিতে এবং বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে সাম্রাজ্যের ও পরাধীন জাতির উপর কর্তৃত্বের প্রয়োজন আরো অধিক হইয়া পড়িবে এবং পরিণামে এই স্কিমের আর্থিক দায় গৌণভাবে পরাধীন জাতিগুলির উপরই হয়ত আসিয়া পড়িবে। শুধু তাহাই নহে, যখনই ইংলণ্ডের শ্রমিক ও মজুর তাহাদের বিবেকবুদ্ধির প্রেরণায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহিবে কিংবা মানুষের মত বাঁচিবার দাবী উপস্থিত করিবে তখনই এই বলিয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করা চলিবে যে, তাহাদের মঙ্গলের জন্য সকল ব্যবস্থাই স্থির করা রহিয়াছে, কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধ না করিলে কিংবা পরাধীন জাতির জন্য চোখের জল ফেলিলে কি করিয়া কাজ চলিবে, ইহাতে তাহাদেরই সম্পূর্ণ ক্ষতি ইত্যাদি। এই জন্যই আমাদের এদেশে বেভারিজ স্কিমের ন্যায় যুদ্ধোত্তর কালের জন্য কোন

স্কিমের সাড়াশব্দ না পাইয়া বড় দুঃখে বলিতে ইচ্ছা হয়—"ভারতবর্ষের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ত' ইংলণ্ডের পুনর্গঠনেরই নামান্তর বা অপর পিঠ। সুতরাং ইংলণ্ডের পুনর্গঠনের স্কিম তৈরী ও কার্যকরী হইলে ভারতের আর ভাবনা কি ?—পৃথক স্কিমের দরকার কি ?"

সমাপ্ত

যুদ্ধের দক্ষিণা সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত

"A. B. Patrika", Calcutta:—Sj. Sen offers in this stimulating volume his provocative articles on war-time finance. The learned author possesses to a remarkable degree the art of discussing complex problems lucidly and aptly. In this book he analyses with scientific impartiality and factual restraint in simple and straightforward Bengali the various phases and problems regarding war expenditure and the seriousness of the present Indian economic condition. He has maintained in this book his well-merited reputation earned by his Takar-Katha which has gone through several editions. It is a book that amply repays reading.

"Industry", Calcutta:—Sj. Sen who has earned a name and fame by his pioneering effort in writing in Bengali some of the most intricate problems of economic science has added to his crown a fresh laurel by presenting his যুদ্ধের দক্ষিণা to the Bengali public. He has a masterly style of his own and his unique originality in the treatment of economic questions requires no testimony. The readers will amply profit by the perusal of the book and enjoy the captivating charm of the author's mode of expression which has enlivened such a dry subject as applied economics.

প্রবাসী, কলিকাতা :—যুদ্ধের ব্যাপক ও বহুদূর প্রসারী আর্থিক অনর্থের কাব্যই লেখক তাঁহার অননুকরণীয় নিজস্ব ভাষায় বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। এইরূপ জটিল বিষয়ের সরল ও সরস আলোচনায় গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত এবং বর্ত্তমান গ্রন্থে ইন্‌ফ্লেশন, না স্বর্ণমৃগ, স্টার্লিঙের প্রেমালিঙন, পরাধীন জাতির রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, লেণ্ড-লিজ রসায়ন, গত যুদ্ধের হিসাব-নিকাশ, জার্মান মার্কের মহাপ্রস্থান প্রভৃতি প্রবন্ধ পড়িয়া যে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি দেশের বর্তমান আর্থিক দুর্গতির কারণ বুঝিতে পারিবেন।

যুগান্তর, কলিকাতা :—গ্রন্থকার ভারতবর্ষের যুদ্ধের ব্যয় ও তাহার অর্থনৈতিক রহস্য ও গুরুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে সমুদয় তথ্য এমন সুন্দর ও সরলভাবে আলোচনা করিয়াছেন যে সাধারণ পাঠকেরও উহা পড়িবার জন্য কৌতুহল জাগে। অর্থনীতির বহু জটিল তত্ত্ব লেখকের শক্তিশালী রচনায় সহজ ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলায় এই ধরণের বইয়ের বহুল প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যেই যে ইহা সমাদৃত হইবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

দেশ, কলিকাতা :—অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে অনাথবাবুর হাত পাকা। তাঁহার **'টাকার কথা', 'করনীতি'** এ দেশে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করিয়াছে। অনাথবাবু প্রতিভাপূর্ণ শাণিত ক্ষুরধার দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক বিষয়ের অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্বের উপর আঘাত হানিবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য স্বদেশপ্রেমযুক্ত হইয়া পাঠকের চিত্তকে উদ্দীপ্ত করে। জটিল অর্থনীতির, সব দিক খতাইয়া, গোছাইয়া, খুঁটিয়া বলিবার ক্ষমতা খুব কম ব্যক্তিরই আছে। গ্রন্থকারের অবদান সেই অভাব দূর করিয়া বাঙলাভাষাকে সমৃদ্ধ করিবে। আমরা ঘরে ঘরে 'এই বইয়ের সমাদর দেখিতে চাই। দেশের যুবকেরা এই পুস্তকের আলোচনা করিলে দেশের বর্তমান সমস্যা সোজাসুজি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে এবং স্বদেশপ্রেমের তাপ অন্তরে অনুভব করিবে। গ্রন্থকার জাতির বর্তমান দুর্দিনে একটি বড় প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়াছেন—এজন্য আমরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি'।

আর্থিক জগৎ, কলিকাতা :—যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতে সামরিক ব্যয় ও ইন্‌ফ্লেশনের সমস্যা জটিল হইয়া দেখা দিলেও, বাঙ্গলা ভাষায় এ সম্পর্কে কোন পুস্তক এতদিন বাহির হয় নাই। অনাথবাবু 'যুদ্ধের দক্ষিণা' বইটি প্রকাশ করিয়া সেই অভাব পূরণ করিলেন। এই পুস্তকে লেখক যুদ্ধকালীন অর্থনীতি ও সমাজজীবনে তাহার প্রতিক্রিয়ার কথা

অতি নিপুণতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। ইন্‌ফ্লেশনের স্বরূপ ও রহস্য ইহাতে ভাল ভাবেই বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তাঁহার অনবদ্য রচনাভঙ্গি ও মুন্সিয়ানার গুণে বর্ত্তমান পুস্তকটি সকল দিক দিয়াই উপভোগ্য হইয়াছে। 'টাকার কথা'র মত 'যুদ্ধের দক্ষিণা' বইটিও সুধী সমাজে সমাদর লাভ করিবে, আমাদের বিশ্বাস।

মন্দিরা, কলিকাতা :—বাঙলা ভাষায় অর্থনীতির জটিল তথ্যগুলিকে জলের মত সোজা করে ও তাতে মিছরির প্রলেপ দিয়ে আমাদের মনের কাছে প্রথম তুলে ধরেন শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন তাঁর 'টাকার কথা' বইখানিতে। 'যুদ্ধের দক্ষিণা' তাঁর এ বিষয়ে তৃতীয় বই। প্রবন্ধ-গুলির নাম থেকেই বোঝা যাবে যে বিষয়গুলি সবই সময়োচিত এবং আমাদের সকলেরই এ সব বিষয়ে ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। বইখানি বাংলায় চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে বিস্তর এবং ইহা আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য।

মাতৃভূমি, কলিকাতা : জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিচার করলে শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেনের অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বইগুলো নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। সাধারণ পাঠকপাঠিকাদের জন্য অর্থনীতির দুরূহ রসকে সহজ পাঠ্য করে পরিবেশন করার কাজে অনাথগোপালবাবু পথপ্রদর্শক।

পূর্ব প্রকাশিত তাঁর অন্য দুটি অর্থনীতির বই—'টাকার কথা' ও 'কর-নীতি'র অভূতপূর্ব সাফল্যই লেখকের কৃতিত্বের নিদর্শন। তাঁর এই পুস্তক দুটির মত 'যুদ্ধের দক্ষিণা'ও জনপ্রিয়তা অর্জন করবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। আলোচ্য পুস্তকের অনেকগুলি লেখা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ইতিপূর্বে পাঠকপাঠিকা সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এ সব বাঙালী পাঠকপাঠিকার যুদ্ধের অর্থনীতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন স্পৃহা আছে, তাঁদের পক্ষে অনাথগোপালবাবুর 'যুদ্ধের দক্ষিণা' অপরিহার্য।

আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা —অনাথবাবু ইতিপূর্বে 'টাকার কথা' ও 'কর নীতি' লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। অর্থনীতির শুষ্ক তত্ত্ব ও তথ্যকে মনোজ্ঞ সরস ভাষায় প্রকাশ করিবার কৃতিত্ব তাঁহার অসাধারণ। সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার সময়ই প্রবন্ধগুলির বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গী ও পরিবেশন নৈপুণ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে যাঁহারা ভাবেন বা ভাবিতে চাহেন তাঁহাদের সকলকেই আমরা বইখানা পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

পঞ্চাশের সাহিত্য –বাংলা ভাষায় ১৩৫০ সনে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস ও জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য উভয়েই অর্থনীতি ক্ষেত্রে এই বইখানাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। 'অর্থনীতিতে অনাথগোপাল সেনের "যুদ্ধের দক্ষিণা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অনাথগোপাল সেনের সব চেয়ে কৃতিত্বের কথা হইল এই যে, তিনি অর্থনীতির আলোচনাতে সাহিত্যের সরসতা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। ফলে, 'যুদ্ধের দক্ষিণা' একাধারে অর্থনীতি, দেশপ্রীতি এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নিদর্শন হইয়া উঠিয়াছে।

অরণি, কলিকাতা —অর্থনৈতিক জটিল বিষয় সাধারণের নিকট সরস ও সহজবোধ্য করিয়া তুলিবার মত মুন্সীয়ানা অনাথবাবুর আছে। আমাদের আর্থিক দুর্গতির কারণ এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের অক্ষমতা ও অব্যবস্থার যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা পাঠ করিয়া অনেক কিছুই শিখিলাম। বাঙ্গলা ভাষায় এমন একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার অর্থনীতি বিষয়ক জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিলেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থ স্বদেশপ্রেমিক এবং চিন্তাশীল পাঠকগণের সমাদর লাভ করিবে সন্দেহ নাই।